إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

"সবরকারীদিগকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হইবে।"

فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ *

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।; অকৃতজ্ঞ হইও না।"

সবর ও শোকর

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

অনুবাদকের আরজ

ইসলামী দুনিয়ার বরেণ্য মনীষী, প্রাজ্ঞ তাত্ত্বিক ও গবেষক, দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর রচনাবলী ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারকে কতটা সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহা পরিমাপ করিয়া বলা যাইবে না। ইসলামের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর তাঁহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গবেষকদের নিকট এখনো এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে।

'সবর ও শোকর' তাঁহার সেই জাতীয় রচনারই একটি অংশ। সবর ও শোকর আল্লাহর এবাদত-আনুগত্যের পথে দুইটি অন্যতম উপাদান। হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, সবর ও শোকর ঈমানের দুইটি অংশ। ইহা আসমায়ে হুসনা তথা আল্লাহ পাকের গুণবাচক সুন্দর নামসমূহেরও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা যায়, যেই ব্যক্তি এই সবর ও শোকর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবে, তাহার ঈমান এই অংশ পরিমাণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

অথচ এমন দুইটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবে হয়ত মনে করা হয়, আল্লাহর কোন নেয়মত লাভ করিলে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নাম শোকর এবং বালা-মুসীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করাকে বলা হয় সবর। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ এতদ্ অপেক্ষা আর বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার অবকাশ নাই। এই ধারণা সঠিক নহে। বরং এই দুইটি বিষয়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কি পরিমাণ হেকমত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হইতে পারে তাহা এই কিতাবে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর পূর্বে অপর কেহ এমন যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করিয়াছেন কি-না তাহা আমাদের জানা নাই।

আমি অধম এমন একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অনুবাদ করার সুযোগ পাইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শোকর আদায় করিতেছি। অনুবাদকর্ম কতটা সফল হইয়াছে তাহা বিচার করিবেন পাঠকবর্গ। আমার অযোগ্যতা ও অসতর্কতার কারণে যদি কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তবে এই বিষয়ে আমাকে অবহিত করা হইলে আগামী বারে তাহা সংশোধন করার চেষ্টা করা হইবে। পাঠকবর্গ কিতাবটি দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হইলে আমরা নিজেদের শ্রম স্বার্থক মনে করিব।

আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে এখলাস দান করুন। আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উসিলা করিয়া দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত–
মোহাম্মদ খালেদ
কুমিল্লাপাড়া, কামরাঙ্গীর চর
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

তারিখ
নভেম্বর ১৯৯৮ ইং

সূচীপত্র

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

সবর ও শোকর

گر دولت سرمدی تجھے ہے منظور = کر صبر و شکر دل سے حتی المقدور

ہوتا ہے خدائے پاک صابر کا رفیق = نعمت اسے دیتا ہے جو ہوتا ہے شکور

অর্থাৎ– তুমি যদি (শান্তির) স্থায়ী সম্পদ লাভ করার অভিলাষী হও, তবে মনে-প্রাণে যথাসম্ভব সবর ও শোকরের পথ অবলম্বন কর। কারণ, যেই ব্যক্তি সবর ও শোকর তথা ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করে; আল্লাহ পাক তাহার সঙ্গী হন এবং তাহাকে স্বীয় নেয়মত দান করেন।

হাদীসে পাক ও বুজুর্গানে দ্বীনের বাণী দ্বারা জানা যায় যে, ঈমানের দুইটি অংশ। যথা– সবর ও শোকর। আল্লাহ পাকের গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে সাবুর ও শাকুর এই দুইটিই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সবর ও শোকর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা যেন ঈমানের দুইটি অংশ এবং আল্লাহ পাকের দুইটি গুণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকারই নামান্তর। ঈমান ব্যতীত আল্লাহ পাকের 'কোরব' ও নৈকট্য লাভ করার কোন উপায় নাই। এদিকে কোন্ বিষয়ের উপর এবং কোন্ সত্তার উপর ঈমান স্থাপন করিতে হইবে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া ঈমানের পথে চলাও অসম্ভব। যেই ব্যক্তি ইহা জানার ব্যাপারে অবহেলা করিবে, সেই ব্যক্তি সবর ও শোকরের পরিচয় লাভেও ব্যর্থ হইবে। নিম্নে আমরা সবর ও শোকর তথা ঈমানের এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবর

আল্লাহ পাক বিবিধ বিশেষণ দ্বারা সবরকারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পবিত্র কোরআনে সত্তুরের ও অধিক স্থানে সবরের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তা ছাড়া বহু মর্যাদা ও কল্যাণকর্ম এই সবরেরই ফসল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এরশাদ হইয়াছে–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

অর্থাৎ– তাহারা যখন সবর করিল, তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে পথপ্রদর্শক করিলাম, যাহারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করিত। (সূরা সেজদা– ২৪ আয়াত)

অনত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ– তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বণী ইসরাঈলদের জন্য তাহাদের সবরের দরুন। (সূরা আ'রাফ– ১৩৭ আয়াত)

আরো বলা হইয়াছে–

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ– যাহারা সবর করে, আমি তাহাদিগকে প্রাপ্য প্রতিদান দিব তাহাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ যাহা তাহারা করিত। (সূরা নহল– ৯৬ আয়াত)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

অর্থাৎ– তাহারা তাহাদের পুরস্কার দুইবার পাইবে। কারণ তাহারা সবর করিয়াছে। (সূরা কাছাছ– ৫৪ আয়াত)

অনুরূপভাবে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ– সবরকারীদিগকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হইবে। (সূরা যুমার– ১০ আয়াত)

উল্লেখিত শেষোক্ত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, কেবল সবর ব্যতীত অপরাপর নেক আমলের ছাওয়াব হিসাব করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইবে এবং সবরের বিনিময় দেওয়া হইবে বে-হিসাব। অনুরূপভাবে রোজা অর্ধেক

সবর হওয়ার কারণে উহাও সবরের মধ্যেই গণ্য। যেমন হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হইয়াছে–

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

অর্থাৎ– রোজা আমার জন্য এবং আমি উহার বিনিময় প্রদান করিব।

আল্লাহ পাক রোজা ব্যতীত অন্য এবাদতকে নিজের জন্য খাস করিয়া উল্লেখ করেন নাই। এদিকে সবরের ছাওয়াবের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ *

অর্থাৎ– "তোমরা সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।"

অন্য আয়াতে তিনি নিজের সাহায্যকে সবরের সঙ্গে সর্তযুক্ত করিয়া এরশাদ করিয়াছেন–

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ *

অর্থাৎ– অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তাহারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন। (সূরা আলে-ইমরান– ১২৫ আয়াত)

অন্য এক আয়াতে সবরকারীদের জন্য এমন সব নেয়মতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অন্যদের জন্য বলা হয় নাই।। এরশাদ হইয়াছে–

وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ *

অর্থাৎ– তাহারা সেই সমস্ত লোক, যাহাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রহিয়াছে এবং এই সকল লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। বাক্বারা–১৫৭ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে হেদায়েত, অনুগ্রহ ও রহমত সবরকারীদের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। সবরের ফজীলত প্রসঙ্গে বহু আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ে হাদীসের সংখ্যাও অনেক। এক হাদীসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

অর্থাৎ– "সবর হইল ঈমানের অর্ধেক।"

অন্য হাদীসে বলা হইয়াছে– যেই সকল বিষয় তোমাদিগকে কম দেওয়া হইয়াছে, উহার মধ্যে একীন ও সবর অন্যতম। তোমরা যদি নিজেদের বর্তমান অবস্থার উপর সবর কর, তবে উহা আমার নিকট এক ব্যক্তি সকলের সমপরিমাণ আমল লইয়া আসা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। কিন্তু আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, আমার পর তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমরা একে অপরকে খারাপ মনে করিবে। এই সময় আকাশের অধিবাসীগণ তোমাদিগকে খারাপ মনে করিবে। এই পরিস্থিতিতে যেই ব্যক্তি ছাওয়াবের নিয়তে সবর করিবে সে পরিপূর্ণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ * وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ

بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

অর্থাৎ– তোমাদের নিকট যাহা আছে, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে, তাহা কখনো শেষ হইবে না। যাহারা সবর করে আমি তাহাদিগকে প্রাপ্য প্রতিদান দিব তাহাদের উত্তম কর্মের প্রতিদান স্বরূপ, যাহা তাহারা করিত। (সূরা নহল– ৯৬ আয়াত)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি? জবাবে তিনি ফরমাইলেন, সবর করা ও দান করা। অপর এক হাদীসে আছে–

اَلصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ– সবর হইল জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার।

একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কেহ আরজ করিল, ঈমান কি? জবাবে তিনি ফরমাইলেন, "ঈমান হইল সবর করা।" অর্থাৎ সবর ঈমানের একটি অন্যতম রোকন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর ওহী নাজিল করেন যে, আমার স্বভাবের মত তোমার স্বভাব গঠন কর। আমার স্বভাব হইল, আমি সাবুর (অধিক সবরকারী)। হযরত আতা বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ঈমানদার? আনসারগণ নীরব রহিলেন। এই সময় হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমরা ঈমানদার। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের ঈমানের পরিচয় কি? আনসারগণ জবাব দিলেন, আমরা সুখের সময় শোকর করি, কষ্টে

সবর করি এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কা'বার রবের কসম, তোমরা ঈমানদার।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

الصبر عَلٰى مكره خيرًا كثيرًا

অর্থাৎ– "তোমাদের নিকট যাহা অপ্রিয় মনে হয় উহাতে বহু কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।" হযরত ঈসা (আঃ) ফরমাইয়াছেন– তুমি তখনই তোমার প্রিয় বিষয়টি লাভ করিবে, যখন অপ্রিয় বস্তুর উপর সবর করিবে।

সবরের ফজিলত সম্পর্কে মহা মনীষীগণের বহু বাণী উদ্ধৃত আছে। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মুসা আশআরীকে যেই পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, সবরকে নিজের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইবে। স্মরণ রাখিও, সবর দুই প্রকার এবং উহার একটি অপরটি হইতে উত্তম। মুসীবতের সময় সবর করা ভাল, কিন্তু উহা হইতে উত্তম হইল আল্লাহর কৃত বণ্টনের উপর সবর করা। মনে রাখিও, সবর হইল ঈমানের মূল। কারণ, সর্বোত্তম নেকী হইল তাকওয়া যাহা সবর দ্বারা অর্জিত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, চারিটি বিষয়ের উপর ঈমানের স্থিতি নির্ভরশীল। যথা– একীন, সবর, জেহাদ ও সুবিচার। তিনি আরো বলিয়াছেন, ঈমানের সঙ্গে সবরের সম্পর্ক এমন, যেমন দেহের সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক। অর্থাৎ, মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, অনুরূপ যাহার সবর নাই, তাহার যেন ঈমান নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, সবরকারীদের উভয় গাঁটরিই উত্তম এবং উহার অতিরিক্তটিও উত্তম। এখানে 'গাঁটরি' অর্থ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও রহমত। আর অতিরিক্তটি হইল হেদায়েত। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তিনি সবরকারীদের সেই ছাওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যাহা পবিত্র কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ *

অর্থাৎ– "তাহারা সেই সমস্ত লোক, যাহাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রহিয়াছে এবং এই সকল লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।" (সূরা বাক্বারা– ১৫৭ আয়াত)

অর্থাৎ– সবরকারীদের জন্য অনুগ্রহ ও রহমত এমন, যেমন সওয়ারীর উভয়দিকের দুইটি গাঁটরি। আর হেদায়েত যেন সেই ছোট্ট গাঁটরিবিশেষ যাহা সওয়ারীর উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়।

হযরত হাবীব বিন হাবীব যখন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিতেন, তখন তিনি বলিতেন– সোবহানাল্লাহ! তিনি অনুগ্রহও করিয়াছেন আবার প্রশংসাও করিতেছেন। অর্থাৎ– আল্লাহ পাক নিজেই 'সবর' দান করিয়াছেন আবার তিনি নিজেই উহার প্রশংসা করিতেছেন। আয়াতটি এই–

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهٗ أَوَّابٌ

অর্থাৎ– আমি তাহাকে পাইলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরা ছোয়াদ– ৪৪ আয়াত)

সবরের হাকীকত

উপরে সবরের ফজীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সবরের হাকীকত এবং উহার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করিব। সবর হইল দ্বীনের একটি মোকাম এবং আধ্যাত্ম পথের একটি মনজিলের নাম। দ্বীনের যাবতীয় মোকাম তিনটি বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত। সেই তিনটি বিষয় হইল– মা'রেফাত, হাল এবং আমল। মা'রেফাত হইল সকল কিছুর মূল। এই মা'রেফাত হইতে হাল উৎসারিত হয় এবং হাল হইতে আমলের বাস্তব বিকাশ ঘটে। সুতরাং হাল যেন মা'রেফাত বৃক্ষের ডালপালা এবং আমল যেন উহার ফলবিশেষ। এই বিষয়টি এমন যাহা আধ্যাত্ম পথের পথিকদের সকল মনজিলেই বিদ্যমান। ঈমান শব্দটি কখনো মা'রেফাতের অর্থে ব্যবহার হয় আবার কখনো উহা এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টির অর্থে প্রয়োগ হয়। মানুষের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সবর তখনই হয় যখন প্রথমে মারেফাত অর্জিত হইয়া পরে একটি হাল জারী হয়। আসলে এই দুইটির নামই সবর। আর আমল যেন উহার ফল যাহা ঐ দুইটি বিষয় হইতে প্রকাশ পায়।

ফেরেশতা, মানুষ ও পশুর স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সবরের স্বরূপ জানা যাইবে। সবর হইল মানুষের বৈশিষ্ট্য। ইহা ফেরেশতা ও পশুর মধ্যে নাই। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ এমনই পূর্ণতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, অতঃপর তাহাদের মধ্যে আর সবরের কোন প্রশ্নই আসে না। অনুরূপভাবে পশুর মধ্যে অপূর্ণতার কারণেই উহাদের মধ্যে সবর অবর্তমান। পশুর মধ্যে কামনা-বাসনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহারা কামনা-বাসনার অধীন। এই কারণেই উহাদের জীবনের গতি-প্রকৃতির সকল কিছুর মূল লক্ষ্য এই কামনা-বাসনা ছাড়া আর কিছুই নহে। পশুর মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই কামনা-বাসনার প্রতিবন্ধক হইয়া উহা হইতে তাহাদেরকে ফিরাইয়া রাখিতে পারে। যেই শক্তি এই কামনা-বাসনা হইতে ফিরাইয়া রাখে উহাই সবর।

আল্লাহ পাক এই কারণে ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তাহারা আল্লাহর এবাদতে নিবিষ্ট থাকে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভে সন্তুষ্ট থাকে। তাহাদের মধ্যে এমন কোন কামনা-বাসনা রাখা হয় নাই যাহা তাহাদেরকে আল্লাহর এবাদতের আগ্রহ ও নিবিষ্টতা এবং নৈকট্য অর্জনের পথে বাঁধা সৃষ্টি করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষের অবস্থা হইল– শৈশবের সূচনা হইতেই সে পশুর মত অপূর্ণতা লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এই সময় তাহার মধ্যে এক দুর্নিবার খাদ্যস্পৃহা স্বক্রিয় থাকে, তখন অন্য কোন কামনা তাহার মধ্যে থাকে না। কিছু দিন পর তাহার মধ্যে খেলা-ধুলা ও সাজসজ্জার আগ্রহ পয়দা হয়। আরো কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার মধ্যে বিবাহের কামনা জাগ্রত হয়। অর্থাৎ শৈশব, কৈশো২র ও যৌবনের পর্যায়ক্রমিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে পরপর এই সকল চাহিদা জন্ম নেয়। শুরু অবস্থায় মানুষের মধ্যে সবরের শক্তি পয়দা হয় না। সেই সময় কেবল কামনা-বাসনা নামের একটি শক্তিই তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন পশুর মধ্যেও কেবল ঐ একটি শক্তিই থাকে। মানুষের মধ্যে বিপরীতধর্মী দুইটি শক্তির সংঘর্ষের পর একটিকে পরাভূত করিয়া অপর যেই শক্তিটি স্থিতি লাভ করে, উহারই নাম সবর।

আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহার মর্যাদা পশুর ঊর্ধ্বে দান করিয়াছেন। এই মানুষ যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়, তখন তাহার উপর দুইজন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়। এই দুই ফেরেশতার একজন তাহাকে হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শন করে এবং অপরজন তাহাকে এই পথে সহায়তা করে। এই দুই ফেরেশতার সহায়তায় মানুষ পশু হইতে স্বাতন্ত্র্য মর্যাদার অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষ সিফাত ও গুণের বিকাশ ঘটে। সেই দুইটি গুণ হইল– আল্লাহ ও রাসূলের মারেফাত এবং ভাল-মন্দ কর্মের পরিণাম। হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতার কল্যাণেই এই গুণটি পয়দা হয়। কিন্তু পশুরা আল্লাহ-রাসূলকেও চিনিতে পারে না এবং কর্মের পরিণাম সম্পর্কেও উহাদের কোন জ্ঞান নাই। এই কারণেই উহারা কেবল নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে মজাদার খাবার অন্বেষণ করিয়া ফিরে। এমনকি উহাদের সম্মুখে যদি কোন উপকারী ঔষধ রাখা হয় এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে উহা যদি তিক্ত হয় তবে কিছুতেই সে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। বরং এই ঔষধ যে একটি উপকারী বস্তু ইহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না।

পক্ষান্তরে সৃষ্টির সেরা মানুষ হেদায়েতের নূর দ্বারা এই কথা জানিতে পারিয়াছে যে, শাহওয়াত ও কামনা-বাসনার আনুগত্য করার পরিণতি তাহার জন্য শুভ নহে। অবশ্য এই হেদায়েত বা ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকাই

যথেষ্ট নহে, বরং উহা পরিহার করার ক্ষমতাও থাকিতে হইবে। এই কারণেই দেখা যায়, অনেক সময় কোন খাদ্যবস্তুর ক্ষতিকর ক্রিয়া জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ উহা ভক্ষণ করে এবং পরিণতিতে অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই সময় মানুষের পক্ষে এমন শক্তি আবশ্যক যেই শক্তি দ্বারা সে শাহ্ওয়াত প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করিয়া উহার অনিষ্ট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। এতদ্উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বান্দার জন্য অপর একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন যেই ফেরেশতা তাহাকে খায়ের ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং এক অদৃশ্য ফৌজের মাধ্যমে তাহার সহযোগিতা করে। এই ফৌজ শাহওয়াত ও বাসনার ফৌজের সঙ্গে লড়াই করিতে আদিষ্ট। এই যুদ্ধে সে কখনো পরাস্ত হয় আবার কখনো জয়ী হয়। অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে যেই পরিমাণ গায়েবী মদদ পায় সেই অনুপাতেই জয়-পরাজয় হয়।

উপরে হেদায়েতের যেই নূরের কথা বলা হইল, মানুষের মাঝে উহার বিভিন্নতা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, উহার কোন সংখ্যা-সীমা হইতে পারে না। মানুষ যেই ফৌজ দ্বারা নিজের শাহওয়াতকে পরাভূত করিয়া পশু হইতে এম্তিয়াজ ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, আমরা উহার নাম রাখিব "দ্বীনী জযবা" এবং কামনা-বাসনার নাম রাখিব "শাহওয়াতী জযবা"। মনে কর, এই উভয় ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধে কখনো দ্বীনী জযবা অগ্রগামী হয় আবার কখনো শাহ্ওয়াতী জযবা হয় প্রবল। এই যুদ্ধের ময়দান হইল মানুষের অন্তর। দ্বীনী জযবা আল্লাহর ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে সাহায্য পায়। আর শাহ্ওয়াতী জযবাকে সাহায্য করে শয়তান। অর্থাৎ এই যুদ্ধে শাহ্ওয়াতী জযবার সঙ্গে মোকাবেলা করিয়া দ্বীনী জযবা অটল থাকাই হইল সবরের হাকীকত। প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া যদি এই সবরের উপর অটল থাকা হয় তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সবরকারীদের মধ্যে গণ্য করা হইবে। পক্ষান্তরে এই ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং শাহ্ওয়াত ও কামনা-বাসনার নিকট পরাজয় বরণ করা হয় তবে এই ব্যক্তি শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, যাবতীয় কামনা-বাসনা ত্যাগ করা এমন একটি আমল যাহা সবর হইতে উৎসারিত হয়। অর্থাৎ সবরের উপর অটল থাকার দাবী হইল, কামনা-বাসনার সর্বপ্রকার দাবী উপেক্ষা করা। আর এই সবরের উপর অটল থাকা এমন একটি হাল যাহা শাহওয়াতের অপকারিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের পরই পয়দা হয়। শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনার উপকরণসমূহ হইল দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের পথের অন্তরায় ও শত্রু। আর এই বিষয়ের জ্ঞানই হইল ঈমান। এই ঈমান যখন শক্তিশালী হয় তখন দ্বীনী জযবাও শক্তিশালী হয়। ফলে মানুষের

জীবনাচরণ ও যাবতীয় কাজকর্ম শাহ্ওয়াতের বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করে।

মোটকথা, মানুষ কামনা-বাসনা ত্যাগ করার পথে তখনই পূর্ণতা অর্জন করিবে যখন শাহওয়াতী জযবার বিপরীতে অবস্থিত তাহার "দ্বীনী জযবা" শক্তিশালী হইবে এবং কামনা-বাসনার অশুভ পরিণামের একীনও শক্তিশালী হইবে। উপরে যেই দুইজন ফেরেশতার কথা বলা হইয়াছে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এই কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন মানুষের দ্বীনী জযবা ও শাহওয়াতী জযবার প্রতি নজর রাখে। এই দুই ফেরেশতাকে বলা হয় "কিরামান্ কাতেবীন"। মানুষ যখন গাফলতে নিপতিত হয়, তখন যেন সে ডান দিকের ফেরেশতা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার সঙ্গে অসদাচরণ করে। ফেরেশতা এই অসদাচরণকে গোনাহ হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন ফিকির করে এবং নেক আমলে তৎপর হয়, তখন সে যেন ডান দিকের ফেরেশতার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং ফেরেশতা তাহার এই মনোযোগকে নেকী লিপিবদ্ধ করিয়া লয়।

অনুরূপভাবে মানুষ যখন ক্রমাগত গোনাহ করিতে থাকে, তখন সে যেন বাম দিকের ফেরেশতা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার সাহায্য প্রত্যাশা করে না। অর্থাৎ এইভাবেই সে ঐ ফেরেশতার সঙ্গে অসদাচরণ করে এবং উহার বরাবরে ফেরেশতা তাহার নামে গোনাহ লিখিয়া লয়। আর মানুষ যখন স্বীয় নফসের সঙ্গে মোজাহাদা করে, তখন যেন সে ঐ ফেরেশতার সাহায্য প্রত্যাশা করে এবং ফেরেশতা ইহাকে নেকী হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। ফেরেশতাদের এই লিখন মানুষ চর্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। কিরামান কাতেবীনের লিখিত মানুষের এই গোপন আমলনামা দুইবার খোলা হইবে। একবার ছোট কেয়ামতের সময় এবং একবার বড় কেয়ামতের সময়। ছোট কেয়ামত হইল মৃত্যু। যেমন হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ مَاتَ فَقَدْ مَات قِيَامَته

অর্থাৎ– "যে মৃত্যুবরণ করে, তাহার কেয়ামত কায়েম হইয়া যায়।"

এই কেয়ামতে মানুষ একা থাকে এবং তাহাকে বলা হয়–

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ– তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ হইয়া আসিয়াছ, আমি প্রথমবার তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। (সূরা আন'আম– ৯৫ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

অর্থাৎ– আজ নিজের জন্য তুমিই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী।
(সূরা বনী ঈসরাইল –১৪ আয়াত)

অবশ্য বড় কেয়ামতে সকল মানুষ একত্রে উপস্থিত থাকিবে এবং সকলের সম্মুখেই হিসাব গ্রহণ করা হইবে। এই কেয়ামতে নেককারগণ দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং অপরাধীরাও দলে দলে দোজখে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ তখন কেহই একা একা থাকিবে না।

বড় কেয়ামতে যত বিভীষিকা ও ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হইবে, সেই সমুদয়ের দৃষ্টান্ত ছোট কেয়ামতেও রহিয়াছে। যেমন বড় কেয়ামতের একটি অবস্থা হইল ভূকম্পন। ইহা ছোট কেয়ামত তথা মানুষের মৃত্যুর মধ্যে পাওয়া যাইবে। মানুষের জন্য যেই জমিনটি নির্দিষ্ট অর্থাৎ– "মানব দেহ" মৃত্যুর সময় উহাতে ভিষণ কম্পন সৃষ্টি হয়। এই কম্পন কোন অংশেই ভূকম্পনের চাইতে কম নহে। মানব দেহকে জমিনের সঙ্গে উপমা দেওয়ার কারণ হইল, মানুষও মাটিরই তৈরী। মাটি বা জমিনের মধ্যে অপরাপর যেই সকল বিষয় পাওয়া যায়, সেই সমুদয় মানবদেহেও বিদ্যমান। যেমন মানবদেহের হাড় যেন জমিনের পাহাড়বিশেষ। জমিনের উপরস্থিত আকাশ যেন মানবদেহের মস্তক। জমিনের সূর্য যেন মানবদেহের অন্তর। অনুরূপভাবে কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা ইত্যাদি যেন তারকাতুল্য। মানব দেহ হইতে ঘর্ম নির্গত হওয়া যেন জমিনের সমুদ্র। হাত-পা যেন জমিনের বৃক্ষতুল্য। এইভাবেই অপরাপর অঙ্গসমূহকে কেয়াস করিয়া লইতে হইবে।

মৃত্যুর ফলে মানুষের অঙ্গসমূহ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার মাধ্যমে কালামে পাকের নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবায়ন ঘটিবে–

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

অর্থাৎ– যখন পৃথিবী তাহার কম্পনে প্রকম্পিত হইবে। (সূরা যিলযাল –১ আয়াত)

মানব দেহের গোশত হাড় হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার সহিত কেয়ামতের সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণ এইরূপ–

حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً *

অর্থাৎ– পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হইবে ও চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। (সূরা হাক্কাহ –১৪ আয়াত)

মানুষের হাড় গলিয়া যাওয়ার সহিত কেয়ামতের তুল্য ঘটনা–

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

অর্থাৎ– যখন পর্বতমালাকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। (সূরা মুরছালাত -১০ আয়াত)

মানুষের মস্তক কাটিয়া যাওয়ার বিষয়টি যেন কেয়ামতের নিম্নোক্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অর্থাৎ– যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। (সূরা ইনশিক্কাক – ১ আয়াত)

মৃত্যুর সময় মানুষের অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ার সঙ্গে কেয়ামতের উপমা–

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অর্থাৎ– যখন সূর্য আলোহীন হইয়া যাইবে। (সূরা তাকবীর – ১ আয়াত)

মৃত্যুর সময় মানুষের চক্ষু, কর্ণ এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় অকেজো হইয়া যাওয়ার বিষয়টির সহিত কেয়ামতের সাদৃশ্যতা এইরূপ–

اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ

অর্থাৎ যখন নক্ষত্র মলিন হইয়া যাইবে। (সূরা তাকবীর– ২ আয়াত)

মৃত্যুর ভয়ের কারণে কপালে ঘাম বাহির হইয়া আসার অবস্থাটি যেন এইরূপ–

اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

অর্থাৎ– যখন সমুদ্রকে উত্তাল করিয়া তোলা হইবে। (সূরা ইনফিতার – ৩ আয়াত)

অনুরূপভাবে রূহ দেহ হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার অবস্থাটি যেন এইরূপ–

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ

অর্থাৎ– এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হইবে এবং পৃথিবী উহার গর্ভস্থিত সকল কিছু বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও গর্ভশূণ্য হইয়া যাইবে।
(সূরা ইনশিক্কাক – ৩৪ আয়াত)

মোটকথা, কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটির উদাহরণই মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থায় বিদ্যমান। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উহার বিস্তারিত বিবরণ অসম্ভব বটে। ছোট কেয়ামতের সহিত বড় কেয়ামতের ব্যবধান এমন, যেমন মানুষের প্রথম জন্মের সহিত দ্বিতীয় জন্মের ব্যবধান। অর্থাৎ মানুষের জন্মও দুই প্রকার। প্রথমে সে পিতার

ঔরস হইতে মাতার গর্ভে আসে এবং পূর্ণাঙ্গ দেহ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কয়েকটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাহাকে এখানেই অবস্থান করিতে হয়। অতঃপর মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ পরিসর ত্যাগ করিয়া সুবিশাল পৃথিবীতে তাহার আগমন ঘটে। ইহা তাহার দ্বিতীয় জন্ম। এই দুই জন্মের মাঝে যেই ব্যবধান, ছোট কেয়ামত ও বড় কেয়ামতের মধ্যকার ব্যবধানটি ততোধিক ব্যাপক। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থাৎ– তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নহে। (সূরা লোকমান – ২৮ আয়াত)

মানুষের দ্বিতীয়বার জন্মের অবস্থাটিও যেন প্রথম বারের জন্মের মতই। বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের জন্ম কেবল এই দুই সংখ্যার মাঝেই সীমাবদ্ধ নহে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ *

(সূরা ওয়াক্বিয়াহ – ৬১ আয়াত)

অর্থাৎ– এবং তোমাদিগকে এমন করিয়া দেই যাহা তোমরা জান না।

মোটকথা, যেই ব্যক্তি উভয় কেয়ামত বিশ্বাস করিবে, সেই ব্যক্তি মানব জন্মের বর্ণিত দুইটি অবস্থাও স্বীকার করিবে। আর যেই ব্যক্তি ছোট কেয়ামত বিশ্বাস করে বটে কিন্তু বড় কেয়ামতের কথা বিশ্বাস করে না, তাহার যেন একটি চক্ষু অন্ধ। সে কেবল একটি জগতের কথাই বিশ্বাস করে। ইহার নাম মুর্খতা ও গোমরাহী। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই এক চক্ষুবিশিষ্ট হওয়া যেন দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য।

লোকসকল! মানুষের সম্মুখে বিপর্যয়ের এতসব আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকার পরও অসতর্ক ও গাফেল হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? তর্কের খাতিরে যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, মুর্খতা ও গোমরাহীর কারণেই বড় কেয়ামতকে বিশ্বাস করা হইতেছে না, তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলিব, ছোট কেয়ামতই কি খুব কম কথা? ইহাতে কি কোন ভয় ও আশঙ্কার কারণ নাই? তোমরা কি এই হাদীস শুনিতে পাও নাই–

كفى بالموت واعظا

–"মৃত্যু নসীহত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।"

তোমরা কি ইহাও শুনিতে পাওনাই যে, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় কতটা অস্থির ছিলেন যে, তিনি ঐ সময় বলিতেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

– আয় আল্লাহ! মোহাম্মদের উপর মৃত্যুর কাঠিন্য সহজ কর।

এই বিষয়ে তোমাদের কি এতটুকু লজ্জা হয় না যে, মৃত্যুর আগমন বিলম্ব মনে করিয়া নির্বোধ ও গাফেলদের অনুকরণ করিতেছ? এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা যেন এইরূপ–

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ * فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ *

অর্থাৎ– তাহারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করিতেছে, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে তাহাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। তখন তাহারা ওসিয়ত করিতেও সক্ষম হইবে না এবং তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। (সূরা ইয়াছীন – ৩০ আয়াত)

এই শ্রেণীর অমনোযোগী ও গাফেলদের অবস্থা হইল, তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য কোন রোগ-ব্যাধি দেওয়ার পরও তাহাদের বোধোদয় ঘটেনা। মৃত্যুর পয়গাম লইয়া বার্ধক্যের আগমনের পরও উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ، مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ– "বান্দাদের জন্য আক্ষেপ যে, তাহাদের নিকট এমন কোন রাসূলই আগমন করে নাই যাহাদের প্রতি তাহারা বিদ্রূপ করে নাই।" (সূরা ইয়াছীন – ৩১ আয়াত)

অতঃপর তাহারা যদি এই কথা মনে করিয়া থাকে যে, আমরা চির দিন দুনিয়াতে বসবাস করিব, তবে তাহারা যেন কালামে পাকের নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি লক্ষ্য করে।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يَرْجِعُوْنَ *

অর্থাৎ– "তাহারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাহাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি যে, তাহারা তাহাদের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিবে না।" ইয়াছিন আঃ ৩১.

কিংবা তাহারা যদি এই কথা মনে করে যে, মৃতদেহ তো নিশ্চিহ্ন হইয়া

যায় এবং উহার কোন অস্তিত্ব থাকে না- মানুষের এই ধারণা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এরশাদ হইয়াছে-

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ *

অর্থাৎ- "তাহাদের সকলকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হইতেই হইবে।" (সূরা ইয়াছীন – ৩২ আয়াত)

যাহারা আল্লাহ পাকের আয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে-

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ * وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ *

অর্থাৎ- আমি তাহাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি, অতঃপর তাহাদিগকে আবৃত করিয়া দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখে না। আপনি তাহাদিগকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। (সূরা ইয়াছীন- ৯-১০ আয়াত)

এইবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। মোটকথা, শাহওয়াতী জযবার মোকাবেলায় দ্বীনী জযবার উপর জমিয়া থাকার নামই সবর। আর এই মোকাবেলা কেবল নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষের জন্যই নির্ধারিত। এই নির্দিষ্ট শ্রেণী হইল বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নারী-পুরুষ এবং এই শ্রেণীটির উপরই কিরামান কাতেবীন নিয়োগ করা হইয়াছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মস্তিষ্ক বিকৃত মানুষের উপর কিরামান কাতেবীন নিয়োগ করা হয় নাই। ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, যাহারা এই ফেরেশতার সাহায্য প্রত্যাশা করে তাহাদের নামে নেকী লেখা হয়। আর যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদের নামে গোনাহ লেখা হয়। কিন্তু স্বল্প বয়স্ক ও মস্তিষ্ক বিকৃতদের পক্ষে সাহায্য প্রত্যাশা কিংবা মুখ ফিরাইয়া রাখার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং তাহাদের নামে কিছুই লেখা হয় না।

অনেক সময় কৈশোর হইতেই হেদায়েতের নূরের আগমন শুরু হইয়া যৌবনের আগমন পর্যন্ত উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন প্রভাতে সুর্যালোকের ক্ষীণ আভা ক্রমে প্রখর দীপ্তি লাভ করে। কিন্তু কিশোর বয়সের এই হেদায়েত অসম্পূর্ণ। এই হেদায়েত অনুযায়ী আমল করিলে আখেরাতের অনিষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু দুনিয়ার কষ্ট হইতে রেহাই পাইবে না। যেমন এই সময় নামাজে অবহেলা করিলে দুনিয়াতে তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করা চলিবে, কিন্তু এই অবহেলার কারণে পরকালে তাহার উপর কোন শাস্তি হইবে

না এবং তাহার আমলনামায়ও কিছু লেখা হইবে না, যাহা পরকালে খোলা হইবে। বালকের অভিভাবক যদি নেককার হন তবে তাহার কর্তব্য, কিরামান কাতেবীনের মত বালকের কচি হৃদয়ে ভাল ও মন্দের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া। অতঃপর সে যদি কোন ভাল কাজ করে তবে তাহার প্রশংসা করিবে এবং অবহেলা করিলে তাম্বীহ করিবে। যেই অভিভাবক এইভাবে বালকের তরবিয়ত করিবে, সে ফেরেশতার স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইবে এবং ফেরেশতাদের মতই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে এবং আম্বিয়া, সিদ্দিকীন ও নৈকট্যপ্রাপ্তগণের দলের মধ্যে গণ্য হইবে।

সবরের বিভিন্ন নাম

সবর দুই প্রকার। দৈহিক সবর ও মানসিক সবর। দৈহিক সবর ঃ যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং উহাতে দৃঢ় থাকা- ইত্যাদি। এই দৈহিক সবরও আবার দুই প্রকার। যেমন প্রথমতঃ নিজে কোন কঠিন কাজ করা বা পরিশ্রমসাধ্য কোন এবাদত সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়তঃ অপরের দ্বারা প্রহার, কোন কঠিন ব্যাধি বা মারাত্মক কোন যখম সহ্য করা। এই সবর যদি শরীয়তসম্মত হয় তবে ইহা উত্তম। অন্যথায় ইহাকে উত্তম বলা হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার সবর হইল মানসিক সবরঃ যেমন, নিজের মনকে যাবতীয় কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখা। এই সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। অর্থাৎ এই সবর যদি সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও যৌন বাসনা হইতে করা হয়, তবে ইহার নাম 'ইফফত'। আর অপরাপর মন্দ কাজ হইতে যখন এই সবর করা হইবে, তখন প্রত্যেক মন্দ কাজের বরাবরে এই সবর ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইবে। যেমন বালা-মুসীবত হইতে সবর করা হইলে ইহার নাম সবরই বলা হইবে এবং উহার বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় নৈরাশ্য। যদি অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে এই সবরের নাম আত্মসংযম। উহার বিপরীত অবস্থা হইল আস্ফালন। রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম বীরত্ব এবং উহার বিপরীত অবস্থা হইল কাপুরুষতা। ক্রোধ হজম করার ক্ষেত্রে এই সবর করা হইলে উহার নাম হইবে সহনশীলতা এবং উহার বিপরীত অবস্থা হইল ক্রোধান্ধতা। যুগের কোন আপদ হইতে যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম হইবে অসিম সাহসিকতা এবং উহার বিপরীত হইবে স্বল্প সাহসিকতা। কোন কথা গোপন রাখার বিষয়ে যদি এই সবর করা হয় তবে তাহাকে বলা হইবে "গোপন বিষয় রক্ষক"। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম যুহ্দ বা সংসার নির্লিপ্ততা। উহার বিপরীত অবস্থা হইল লোভ ও সংসারাসক্তি। আর নফসের যাবতীয় চাহিদার ক্ষেত্রে যদি স্বল্পতার উপর সবর করা হয় তবে উহার নাম

ক্বানাআত বা অল্পেতুষ্টি। উহার বিপরীত অবস্থা হইল শাহওয়াত।

মোটকথা, ঈমানের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য সবরের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই একদা ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– সবর। কারণ, ঈমানের কার্যসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল সবর। আল্লাহ পাক সবরের প্রকারসমূহকে এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়া উহার নাম রাখিয়াছেন সবর। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

اَلصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ *

অর্থাৎ– যাহারা অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় সবর করে, তাহারাই হইল সত্যাশ্রয়ী, আর তাহারাই পরহেজগার (সূরা বাক্বারা – ১৭৭ আয়াত)

শক্তি ও দুর্বলতার দৃষ্টিতে সবরের প্রকারভেদ

প্রকাশ থাকে যে, শাহ্ওয়াতী জযবাকে যদি তুলনা করিয়া দেখা হয় তবে দ্বীনী জযবাকে তিনটি অবস্থায় দেখা যাইবে। (ক) শাহওয়াতী জযবাকে এমনভাবে পরাভূত করিয়া দেওয়া যেন উহার মধ্যে মোকাবেলা করার কোন শক্তি না থাকে। নিয়মিত সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা এইরূপ সবর হাসিল হইয়া থাকে। অবশ্য খুব কম লোকের পক্ষেই এই পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব হয়।

তবে যাহারা পৌছাইতে সক্ষম হয় তাহারাই সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহকে স্বীয় পালনকর্তা জ্ঞান করিয়া সর্বদা এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকে। তাঁহারা কখনো সরল পথ বর্জন করে না এবং কখনো আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনী জযবার দাবী বিষয়ে নিজেদের অন্তর সম্পর্কে এত্মিনান ও নিশ্চিত। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

অর্থাৎ– হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরিয়া যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া। (সূরা ফাজর – ২৮ আয়াত)

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা হইল– শাহওয়াতী জযবা গালেব ও বিজয়ী হওয়া এবং দ্বীনী জযবার মধ্যে উহার সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি না থাকা। এই অবস্থায় মানুষ চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হইয়া নিজেকে শয়তানের হাওয়ালা করিয়া দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করিয়া গাফেলদের

অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকদের সংখ্যাই বেশী এবং ইহারা খাহেশাত ও প্রবৃত্তির আনুগত্য করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ *

অর্থাৎ– আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়া অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করিব। (সূরা সেজদা – ১৩ আয়াত)

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করিয়া চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাহাদিগকে হেদায়েত করিতে চাহিলে তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর–

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ *

অর্থাৎ– অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তাহার দিক হইতে আপনি মুখ ফিরাইয়া নিন। তাহাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নজম (২৯-৩০) আয়াত)

বর্ণিত অবস্থার পরিচয় হইল, মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করতঃ পার্থিব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া গর্বিত থাকা। ইহা নির্বুদ্ধিতার চরম স্তর। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد المو ت و الحمق من اتبع هوها و تمنى على الله *

অর্থাৎ– সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের ইচ্ছার অনুকরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বাসনা করে।

অর্থাৎ– এই শ্রেণীর লোককে কেহ উপদেশ দিলে বলে, আমি তো তওবা করিতে চাহিতেছি কিন্তু সময় হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং এই কারণে উহার আশাও করিতেছি না। আর তওবা করার ইচ্ছা না থাকিলে বলে, আল্লাহ পাক তো গাফুরুর রাহীম এবং ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন।

সুতরাং তওবা করার কোন প্রয়োজন নাই। আসলে এই শ্রেণীর লোকদের আকল ও বুদ্ধি শাহওয়াত ও কামনা-বাসনার গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে কেবলই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায় খুঁজিয়া ফিরে যেন প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ করিতে পারে। বুদ্ধি-বিবেচনা প্রবৃত্তির হাতে এমনভাবে বন্দী হইয়া গিয়াছে, যেমন কোন মুসলমান কোন কাফেরের হাতে বন্দী হওয়ার পর ঐ কাফের তাহার দ্বারা শুকর চড়ায় এবং তাহার দ্বারা শরাব পরিবেশনের কাজ সম্পাদন করায়। তাহাদের অবস্থা আল্লাহ পাকের নিকট ঐ ব্যক্তির মত যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জবরদস্তি পাকড়াও করিয়া কোন কাফেরের হাতে বন্দী করিয়া দেয়। কারণ তাহার বড় অপরাধ হইল– যেই ব্যক্তি বিজয়ী থাকা উচিৎ ছিল তাহাকে এমন ব্যক্তির নিকট পরাভূত করা হইল, যেই ব্যক্তি মাগলুব ও পরাভূত থাকা বিধেয়। অর্থাৎ মুসলমানের পক্ষে বিজয়ী থাকা এই কারণে শোভনীয় যে, তাহার মধ্যে দ্বীনের মারেফাত ও দ্বীনী জযবা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কাফের পরাভূত থাকা এই কারণে শোভনীয় যে, তাহার মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে মুর্খতা ও শয়তানী ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান। অর্থাৎ, মর্যাদার ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে ব্যবধানের মূল উৎস হইল আকল ও দ্বীনী সমঝ। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুকে শয়তানী ধ্যান-ধারণার অনুগামী করা গুরুতর অপরাধ বটে। এই ব্যক্তির অবস্থা যেন সেই ব্যক্তির মত, যেই ব্যক্তি কোন পরম দাতা ও দয়ালু বাদশাহ'র উপর আক্রমন করিয়া তাহার সর্বাধিক প্রিয় সন্তানটিকে প্রতিপক্ষের সর্বাধিক প্রতিহিংসাপরায়ন ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিল। এই ব্যক্তির অপরাধ ও নাশোকরীর পরিমাণ কতটা ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হইল, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হইতে পারে না।

(গ) তৃতীয় অবস্থা হইল– সমান সমান মোকাবেলা হওয়া। অর্থাৎ কখনো শাহওয়াতী জযবা প্রবল হইবে, আবার কখনো প্রবল হইবে দ্বীনী জযবা। এইরূপ ব্যক্তি সংঘর্ষে লিপ্ত মুজাহিদদের মধ্যে গণ্য হইবে বটে তবে বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য হইবে না। এই শ্রেণীর লোকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে–

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا

অর্থাৎ– তাহারা একটি নেক আমল এবং অপরটি বদ আমল মিশ্রিত করিয়াছে। (সূরা তাওবা – ১০২ আয়াত)

এই তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা হইল, তাহারা প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার সঙ্গে

মোজাহাদা করে না। তাহাদের অবস্থা পশু হইতেও অধম। কারণ, চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে মারেফাত ও সত্যাশ্রয়ের ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় নাই, যাহা দ্বারা উহারা প্রবৃত্তির সঙ্গে মোজাহাদা করিবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ঐ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু সে উহা কাজে লাগায় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি হতভাগ্য, যেই ব্যক্তি শক্তি ও ক্ষমতা পাওয়ার পরও উহাকে কাজে লাগাইয়া যথাযথ মর্যাদা হাসিল করিল না।

দুঃসাধ্য ও সহজলভ্য হওয়ার বিবেচনায় সবর দুই প্রকার। প্রথমতঃ যাহা সহজলভ্য নহে বা কঠিন পরিশ্রমসাধ্য। ইহা জোরপূর্বক সবর। দ্বিতীয়তঃ যাহা বিনা শ্রমে অর্জিত হয়। ইহা সহজলভ্য সবর। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নফসের উপর বিশেষ কোন চাপ প্রয়োগ করিতে হয় না। মানুষ যখন হামেশা তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং নিজের শুভ পরিণামের উপর পূর্ণ একীন রাখে, তখন সবর করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া যায়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى

অর্থাৎ– "অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাহাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করিব।"

উহার উদাহরণ যেন দুর্বল প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় পালোয়ানের শক্তি। অর্থাৎ এই পালোয়ান যদি শক্তিশালী হয় এবং কুস্তি বিদ্যায়ও পারদর্শী হয় তবে দুর্বল প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিতে তাহার কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না এবং সামান্য শক্তি প্রয়োগ করিয়াই সে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু প্রতিপক্ষও যদি শক্তিশালী হয় তবে তাহাকে ধরাশায়ী করিতে তাহার প্রচুর শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। অনুরূপভাবে দ্বীনী জযবা ও শাহওয়াতী জযবার সংঘর্ষের বিষয়টিকেও এইভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

মোটকথা, তাকওয়া ও পরহেজগারীতে দীর্ঘ দিন অভ্যস্থ থাকার ফলে সবর সহজ হইয়া যায় এবং উহার ফলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মোকাম হাসিল হয়। কারণ সন্তুষ্টির মর্তবা সবরের উর্ধ্বে। এই কারণেই রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اعْبُدُوا اللّٰهَ عَلَى الرِّضَاء فَان لَم تَسْتَطِع فَفِي الصَّبر عَلٰى مَا تكره خَير كثير

অর্থাৎ– তোমরা সন্তুষ্টি দ্বারা আল্লাহর এবাদত কর। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে অপ্রিয় বিষয়ের উপর সবর করার মধ্যে বহু কল্যাণ রহিয়াছে।

জনৈক আরেফ বলেন– সবরকারীদের তিনটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাবতীয় খাহেশাত ও কামনা-বাসনা বর্জন করা। ইহা তওবাকারীদের স্তর। দ্বিতীয়তঃ তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। ইহা সংসারত্যাগী জাহেদগণের স্তর। তৃতীয়তঃ মোহাব্বাত। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বান্দার সঙ্গে যাহা করেন উহাকে মোহাব্বাতের সঙ্গে গ্রহণ করা। ইহা সিদ্দীকীনগণের স্তর। বলাবাহুল্য, এই মোহাব্বাতের মর্তবা সন্তুষ্টির মর্তবার উর্ধ্বে। যেমন সন্তুষ্টির মোকাম সবর অপেক্ষা উত্তম। আর মর্তবার এই সকল স্তর বিশেষ এক প্রকার সবরের মধ্যে একত্রে বিদ্যমান থাকা সম্ভব। উহা হইল– বালামুসীবতের উপর সবর করা।

এখানে অপর একটি জানার বিষয় হইল, শরীয়তের হুকুম হিসাবে সবর কয়েক প্রকার। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কতক সবর ফরজ, কতক মাকরূহ আবার কতক সবর হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে সবর করা ফরজ। যেই সকল বিষয় শরীয়তে মাকরূহ সেই সকল বিষয়ে সবর করা নফল। অনুরূপভাবে যেই সকল পীড়ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেই সকল বিষয়ে সবর করা হারাম। যেমন কেহ অন্যায়ভাবে কাহারো হাত কাটিয়া ফেলিল, আর সে উহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে সবর করিল কিংবা কাহারো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেহ ব্যভিচারে লিপ্ত হইল আর এই ব্যক্তি উহাতে কোন বাধা না দিয়া নীরবে সবর করিল। বলাবাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে যেই পীড়ন শরীয়তে হারাম নহে বটে কিন্তু মাকরূহ, এই ক্ষেত্রে সবর করাও মাকরূহ। মোটকথা, সবরের বিস্তারিত বিধি-বিধান জানা আবশ্যক। "সবর ঈমানের অর্ধেক" কেবল এই কথা জানিয়াই এমন মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, সকল ক্ষেত্রেই সবর করা উত্তম।

সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা

ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, পৃথিবীতে মানুষ যেই সকল অবস্থার মুখোমুখি হয়, সেই সকল অবস্থা দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ, হয় সেইগুলি তাহার চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল হইবে, না হয় প্রতিকুল। অনুকুল বা প্রতিকুল– উভয় ক্ষেত্রেই সবর করিতে হইবে। আরো সোজা কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে সবর করিতে হইবে। নিম্নে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাইব।

প্রথম প্রকার

মানুষের চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল অবস্থাগুলি হইল– স্বাস্থ্য, সম্পদ, জাঁকজমক, পর্যাপ্ত সংখ্যায় ইয়ার-বন্ধু ও চাকর-নৌকর এবং ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপায়-উপকরণ মওজুদ থাকা। এই অবস্থায় সবর করা অধিক

আবশ্যক। কারণ, মানুষ যদি পার্থিব ভোগ বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তবে পর্যায়ক্রমে সে চরম নাফরমানী ও অবাধ্যতার শিকারে পরিণত হইবে। কারণ, মানুষের একটি সাধারণ স্বভাব হইল, বিপুল বিষয়-সম্পদের মালিক হওয়ার পর তাহার মধ্যে অহংবোধ পয়দা হইয়া পরবর্তীতে সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতে থাকে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ– মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আ'লাক – ৬-৭ আয়াত)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, বিপদাপদের সময় ঈমানদার সবর করে। কিন্তু নিরাপদ অবস্থায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন, বিপদের তুলনায় নিরাপদ অবস্থায় সবর করা অধিক কঠিন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সম্পদের আগমন ঘটিলে তাঁহারা বলিলেন, দারিদ্র্য ও বিপদের সময় যখন আমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল, তখন আমরা সবর করিলাম। কিন্তু আমরা যখন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ফেৎনার শিকার হইলাম, তখন আমরা সবর করিতে পারিলাম না। আল্লাহ পাক আমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ– মোমেনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল না করে। (সূরা মুনাফিকুন – ৯ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

অর্থাৎ– তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

الولد مبخلة مجبنة محزنة

অর্থাৎ– সন্তান মানুষকে কৃপণতা, কাপুরুষতা ও দুর্দশায় লিপ্ত করে।

একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে পাইলেন, স্নেহাস্পদ হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) পরিধেয় জামার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে। তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিয়া ফরমাইলেন,

আল্লাহ পাক যথার্থ বলিয়াছেন–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ– "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ"। এই আয়াত পাঠের পর তিনি ফরমাইলেন, আমি আমার সন্তানকে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইতে দেখিয়া নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলাম না এবং তাহাকে তুলিয়া লইলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহার ফলাফল চিন্তা করুন।

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার সময় সবর করা ইহা অনেক বড় কাজ। এই সময় সবর করার অর্থ হইল, উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হওয়া এবং এমন মনে করা যে, ইহা আমার নিকট ক্ষণস্থায়ী আমানত যাহা খুব শীঘ্রই আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। সুতরাং বিষয়-সম্পদের উপর তুষ্ট হইয়া ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকা কোনক্রমেই উচিৎ নহে। বরং আল্লাহর দেওয়া এই সম্পদ ও নেয়মত দ্বারা আল্লাহর হক আদায় করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা, অপর কাহাকেও দৈহিকভাবে সাহায্য করা এবং মুখে সত্য কথা বলা ইত্যাদি। এই জাতীয় সবর শোকরের সহিত সংশ্লিষ্ট। শোকরের উপর কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সামর্থ্যবানের পক্ষে সবর করা এই কারণে সহজ যে, তাহার ক্ষমতা আছে। অন্যথায় বেচারী নিঃস্ব আহমত বিবির মত যাহাদের কোন গতি নাই; তাহাদের পক্ষেতো সবর করা কোন কঠিন কর্ম নহে। কারণ, তাহাদের তো সবর না করিয়া কোন উপায়ই নাই। মনে কর, কাহারো দেহে শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করা হইতেছে, এই ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে সবর করা যতটা সহজ– নিজের দেহে নিজেই ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রক্ত বাহির করা কিন্তু ততটা সহজ নহে। অনুরূপভাবে কোন অভুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে যদি খাবার না থাকে, তবে এই সময় সবর করা যতটা সহজ– উপাদেয় ও সুস্বাদু খাবার মওজুদ থাকা অবস্থায় এই অভুক্তের পক্ষে সবর করা কিন্তু তেমন সহজ নহে।

দ্বিতীয় প্রকার

যেই সকল অবস্থা মানুষের চাহিদা ও স্বার্থের প্রতিকুল, সেইগুলি তিন প্রকার। প্রথমতঃ যেই সকল অবস্থা মানুষের এখ্‌তিয়ারাধীন যেমন, এবাদত-আনুগত্য ও নাফরমানী। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে মানুষের কোন এখ্‌তিয়ার নাই যেমন– দুর্ঘটনা-দুর্বিপাক ও বালামুসীবত। তৃতীয়তঃ প্রাথমিক অবস্থায় এখ্‌তিয়ারাধীন না হইলেও পরবর্তীতে উহা দূর করা সম্ভব। যেমন, উৎপীড়কের

নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

বর্ণিত প্রথম অবস্থার অন্তর্ভুক্ত সেই সকল কর্মকাণ্ড যাহা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহা আল্লাহর আনুগত্য কিংবা নাফরমানী উভয় ক্ষেত্রেই হইতে পারে। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই সবর করা আবশ্যক। তবে আনুগত্য ও এবাদতের ক্ষেত্রে সবর করা কঠিন। কারণ সাধারণতঃ মানুষ আনুগত্য ও দাসত্বকে ঘৃণা করে এবং প্রভুত্বের অভিলাষী হয়। এক বুজুর্গ বলেন, এমন কোন মানুষ নাই যাহার অন্তরে ফেরাউনের সেই উক্তিটি বিদ্যমান নহে। ফেরাউন বলিয়াছিল–

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

অর্থাৎ– "আমি তোমাদের বড় প্রতিপালক।" (সূরা নাযি'আত – ২৪ আয়াত)

ফেরাউন তাহার মনের কথাটি এই কারণে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল যে, সে তাহার দাবীর স্বপক্ষে কিছু অনুসারী পাইয়াছিল এবং তাহার কওমের লোকেরা তাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অন্যদের অবস্থা হইল, তাহারা নিজেদের মনের এই ভাবটি প্রকাশ করিতে অস্বীকার করে বটে, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতর উহা সুপ্ত আছে। এই কারণেই দেখা যায়, অনুগত দাস-দাসী ও চাকর-নৌকররা কোন ত্রুটি করিলে মানুষ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া পড়ে এবং এমন কামনা করে যেন কেহ তাহার হুকুমের কিছুমাত্র অন্যথা করিতে না পারে এবং অধীনস্থদের উপর সর্বদা তাহার প্রভুত্ব বিরাজমান থাকে। এই অবস্থাটিকে মানুষের অন্তরের সুপ্ত অহংকার ও প্রভুত্ব না বলিয়া উপায় আছে কি?

উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, এবাদত ও আনুগত্য সকল অবস্থায়ই একটি কঠিন কর্ম। কিছু কিছু এবাদত এমন যাহা অলসতা ও অবহেলার কারণে অপ্রিয় মনে হয়। যেমন– নামাজ। আবার কিছু এবাদত এমন আছে যাহা কৃপণতার কারণে কঠিন মনে হয়, যেমন– জাকাত। অনুরূপভাবে কতক এবাদত এমনও আছে যাহা অলসতা ও কৃপণতা এই উভয় কারণেই দুঃসাধ্য মনে হয়, যেমন– হজ্ব ও জেহাদ। সুতরাং এবাদতে সবর করার অর্থ হইল, একই সঙ্গে বহুবিধ কঠিন কর্মে সবর করা।

অনুগত ব্যক্তির পক্ষে এবাদতের উপর সবর করার সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। (ক) প্রথমতঃ এবাদতের পূর্বে। অর্থাৎ এবাদতের পূর্বেই নিয়তকে ছহী করিয়া এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে সবর করিতে হইবে। তা ছাড়া কর্তব্য কর্মে দৃঢ় প্রত্যয় এবং আনুগত্যের উপর জমিয়া থাকাও জরুরী। যেই ব্যক্তি নিয়তের হাকীকত, এখলাস, রিয়া, নফসের

প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ইহা ভালভাবেই জানিতে পারিয়াছে যে, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া সবর করা বড় কঠিন কর্ম। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিয়তের উপরই আমল নির্ভরশীল।"

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

অর্থাৎ– "তাহাদিগকে ইহা দ্বারা কোন নির্দেশ করা হয় নাই যে, তাহারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে। (সূরা বাইয়েনাহ – ৫ আয়াত)

এই কারণেই আল্লাহ পাক আমলের পূর্বে সবরের কথা বলিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে–

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

–(কিন্তু যাহারা সবর করে ও নেক আমল করে) (সূরা হুদ – ১১ আয়াত)

(খ) দ্বিতীয়তঃ ঠিক আমল করার সময় সবর করা। অর্থাৎ আমল করার সময় আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল না হওয়া এবং শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমলের আদব ও বিধি-বিধান রক্ষা করিয়া চলা। আর এই ক্ষেত্রে যেই সকল উপসর্গ আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, উহাতে সবর করিতে হইবে।

(গ) তৃতীয়তঃ আমল শেষ হওয়ার পর সবর করা। অর্থাৎ আমল শেষে প্রশংসাপ্রাপ্তি, উহার প্রচার, রিয়া ইত্যাদির প্রত্যাশা না করা এবং নিজেকে বিস্ময়ের নজরে না দেখা। অর্থাৎ আমল শেষ হওয়ার পর যেই সকল বিষয় আমলকে বাতিল ও বিনষ্ট করিয়া দেয়, উহার উপর সবর করিতে হইবে। অন্যথায় আমল বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হওয়া যাইবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন–

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

"নিজেদের আমল নষ্ট করিও না। (সূরা মুহাম্মদ – ৩৩ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

অর্থাৎ– "তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করিও না।" (সূরা বাক্বারাহ – ২৬৩ আয়াত)

সুতরাং যেই ব্যক্তি দান করার পর খোটা দেওয়া এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সবর না করিবে, তাহার আমল বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আনুগত্য বা এবাদত দুই প্রকার। ফরজ ও নফল। এই উভয় প্রকার আমলের ক্ষেত্রেই সবর করিতে হইবে। আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতে উভয়টি একত্রে উল্লেখ করিয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ– আল্লাহ ইনসাফ এহসান ও আত্মীয়কে দান করার হুকুম করেন। (সূরা নহল – ৯০ আয়াত)

এখানে ইনসাফ করা ফরজ, এহ্‌সান বা অনুগ্রহ করা নফল এবং আত্মীয়কে দান করা মানবতা। এই বিষয়ত্রয়ের সব কয়টিতেই সবর করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে গোনাহের কাজেও সবর করিতে হইবে। আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতে যাবতীয় গোনাহ একত্রে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন–

وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ

অর্থাৎ– নির্লজ্জতা, মন্দ কাজ এবং অবাধ্যতার কর্ম করিতে নিষেধ করেন।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

المهاجر من هجر السوء و المجاهد من جاهد هواه

অর্থাৎ– সেই ব্যক্তি মোহাজির, যে মন্দ কাজ ত্যাগ করে এবং সেই ব্যক্তি মুজাহিদ, যে নিজের খেয়াল-খুশির সঙ্গে জেহাদ করে।

যেই সকল গোনাহে মানুষ নিয়মিত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে উহাতে সবর করা বড় কঠিন হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনের খাহেশ ও চাহিদার সঙ্গে যখন অভ্যাসের সংযোগ ঘটে, তখন যেন শয়তানের দুইটি বাহিনী যৌথভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া দ্বীনী জযবার সঙ্গে মোকাবেলা করে। তদুপরি সেই গোনাহটি যদি আসান ও সহজসাধ্য হয়, যাহা সম্পাদন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না; তবে তো উহার উপর সবর করা খুবই কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, মুখের গোনাহ যেমন– গীবত-পরনিন্দা, মিথ্যা, কলহ-বিবাদ, অপবাদ, আত্মপ্রশংসা ইত্যাদির উপর সবর করা খুবই কঠিন। অনুরূপভাবে অপরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কোন কথা বলা, মৃত ব্যক্তিদের বিদ্যা-বুদ্ধি বা পদমর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের সমালোচনা করা, ইত্যাদি বিষয়গুলিতেও সবর করা কঠিন। কারণ

প্রকাশ্যে এইগুলি গীবত বটে, কিন্তু উহার ভিতরগত অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এই ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসাই করা হইয়া থাকে। কেননা, কাহারো কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করার প্রচ্ছন্ন অর্থ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উহা না থাকা এবং নিজের মধ্যে উহা বিদ্যমান থাকার দাবী করা। অর্থাৎ, আত্মা এই গোনাহের মাধ্যমে একই সঙ্গে দুইটি স্বাদ অনুভব করিতেছে। আর এই দুইটি বিষয়ই হইল মানুষের অন্তরের লুক্কায়িত সেই প্রভুত্ব। এই সর্বনাশা প্রভুত্ব হইল দাসত্বের বিপরীত। অথচ এমন ভয়ানক গোনাহের কর্মটি সম্পাদন করিতে মানুষের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। সামান্য জিহবা সঞ্চালন করিয়া অতি সহজেই ইহা সম্পন্ন করা যায়। এই সহজলভ্যতার কারণেই উহার উপর সবর করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। আর আজকাল তো মানুষ ইহাকে কোন অপরাধই মনে করে না। কুত্রাপি কোন মুসলমান রেশমের পোশাক পরিধান করিলে উহাকে দোষণীয় মনে করা হয়। অথচ নিজের মুখ দ্বারা দিন-রাত মানুষের দোষচর্চা করা হইতেছে, আর ইহাকে কোন অপরাধই মনে করা হইতেছে না। হাদীসে পাকে এই গীবত ও দোষচর্চাকে ব্যভিচার অপেক্ষা কঠিন অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গীবত-শেকায়েত ও গর্হিত কথনের গোনাহ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিলে নির্জনতা অবলম্বন ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নাই। কারণ, লোকসমাগমে থাকিয়া নিজের জবানকে হেফাজতের সবর অপেক্ষা একাকী থাকা অবস্থায় উহার উপর সবর করা অনেক সহজ। এদিকে গোনাহের কারণটি যেই পরিমাণ শক্তিশালী বা দুর্বল হইবে, উহার উপর সবর করাও সেই অনুপাতেই কঠিন বা সহজ হইবে। জিহবা সঞ্চালন অপেক্ষা মনের ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ-শঙ্কা মনকে অতি সহজে স্বক্রিয় করিতে পারে। মনের ওয়াসওয়াসাটি এমনই সূক্ষ্ম যে, লোক সমাগম বর্জন করিয়া একাকীত্ব অবলম্বনের পরও মানুষ উহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। মানুষের পক্ষে মনের এই ওয়াসওসার উপর সবর করা সম্ভব হয় না। তবে উহার একটি মাত্র উপায় হইল, মন হইতে যাবতীয় শংসয়-সন্দেহ ও চিন্তা-ভাবনা দূর করিয়া দতস্থলে কোন দ্বীনী ফিকির প্রবল করিয়া দেওয়া। এই উপায় অবলম্বন ব্যতীত ওয়াসওয়াসার উপর সবর করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হইল সেই সকল অবস্থা যাহা শুরুতে মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নহে বটে, কিন্তু পরে উহা দূর করা মানুষের এখতিয়ারাধীন হয়। যেমন কেহ কোন কাজ বা কথা দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দিল কিংবা শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতিসাধন করিল, তবে এই ক্ষেত্রে সবর করা এবং প্রতিশোধ না নেওয়া কখনো ফরজ আবার কখনো মোস্তাহাব। এক ছাহাবী বলেন, কষ্টের মোকাবেলায় সবর

না করা পর্যন্ত আমরা মানুষের ঈমান সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিতাম না। পবিত্র কোরআনে নবীগণের পক্ষ হইতে বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

অর্থাৎ– তোমরা আমাদিগকে যেই পীড়ন কর, আমরা উহাতে সবর করিব। ভরসাকারীদের পক্ষে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ। (সূরা ইবরাহীম –১২ আয়াত)

একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু অর্থ বন্টন করিলে কতক বেদুঈন মুসলমান মন্তব্য করিলেন, ইহা এমন বন্টন নহে যাহাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করা হইয়াছে। তাহাদের এই মন্তব্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাইলে তাঁহার চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি বলিলেন, আমার ভাই মুসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহ রহম করুন, লোকেরা তাঁহাকে আরো অধিক জ্বালাতন করিয়াছে। কিন্তু তিনি সবর করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সবরের নির্দেশ দেওয়া হইছে। এরশাদ হইয়াছে–

وَدَعْ اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ– তাহাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে– (সূরা আহযাব – ৪৮ আয়াত)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ *

অর্থাৎ– আমি জানি যে, আপনি তাহাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হইয়া পড়েন। অতএব, আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। (সূরা হিজর – ৯৭-৯৮ আয়াত)

আরো এরশাদ হইয়াছে–

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ *

অর্থাৎ– পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের পক্ষ হইতে আপনি বহু মন্দ কথা শুনিবেন। অতঃপর আপনি যদি সবর করেন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেন, তবে ইহা হইবে সাহসিকতার কাজ। (সূরা আলে-ইমরান – ১৮৬ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে যেই সবরের কথা বলা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য হইল, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবর করা। প্রতিশোধের ক্ষেত্রে সবর করার মর্তবা অনেক বেশী। কেসাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে যাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় আল্লাহ পাক তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে–

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ– আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, যেই পরিমাণ তোমাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তাহা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (সূরা নহল – ১২৬ আয়াত)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ قطعَكَ وَ اعط مَنْ حَرمك وَ اغف عَمَّنْ ظلمكَ

অর্থাৎ– যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাহাকে দান কর। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।

আমি ইঞ্জিল কিতাবে দেখিয়াছি, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ফরমাইয়াছেন, পূর্ব হইতেই তোমাদের উপর এই নির্দেশ আছে যে, দাঁতের বদলায় দাঁত এবং নাকের বদলায় নাক। অর্থাৎ কেহ তোমার যেই পরিমাণ অনিষ্ট করে, তুমিও তাহার সেই পরিমাণই অনিষ্ট কর। কিন্তু আমি বলি, অনিষ্টের বদলায় অনিষ্ট করিও না। কেহ তোমার ডান গালে আঘাত করিলে বাম গালটিও তাহার দিকে আগাইয়া দাও। কেহ তোমার চাদর লইয়া গেলে তোমার লুঙ্গিটিও তাহাকে দিয়া দাও। কেহ অকারণে তোমাকে এক মাইল দূরে লইয়া গেলে তুমি তাহার সঙ্গে আরো দুই মাইল আগাইয়া যাও। এই সকল বিবরণ দ্বারা জানা গেল যে, অনিষ্ট-উৎপীড়ন ও জুলুমের মোকাবেলায় সবর করা হইল সবরের উচ্চতর স্তর।

তৃতীয় পর্যায়ে হইল এমনসব বিষয়, যেইগুলির শুরু বা শেষে বান্দার কিছুমাত্র এখতিয়ার নাই। যেমন কোন আপন জনের মৃত্যু, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি কিংবা কোন অঙ্গহানী ইত্যাদি। এই সকল বিপদাপদে সবর করাও উত্তম সবর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র কোরআনে তিন প্রকার সবরের কথা বলা হইয়াছে। (১) ফরজ কর্মসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সবর করা। ইহার ছাওয়াব তিনশত গুণ। (২) আল্লাহ পাক যাহা হারাম করিয়াছেন, উহার উপর সবর করা। ইহার ছাওয়াব ছয় শত গুণ। (৩) মুসীবতের সময় সবর

করা। ইহার ছাওয়াব নয়শত গুণ। এই সবর যদিও মোস্তাহাব, কিন্তু ইহা দ্বিতীয় প্রকারের ফরজ সবর অপেক্ষা উত্তম। কারণ, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই হারাম বিষয়ের উপর সবর করিতে পারে; কিন্তু বালামুসীবতের সময় কেবল সেই ব্যক্তিই সবর করিতে পারে, যেই ব্যক্তি সিদ্দিকীনগণের মর্যাদা অর্জন করিবে। এই কারণেই পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

اَسْئَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تهون عَلى بِه مَصَائِبَ الدُّنيَا

– আয় আল্লাহ্! আমি এমন একীন প্রার্থনা করি যাহা দ্বারা পার্থিব বিপদাপদ আমার জন্য সহজ হইয়া যায়।

হযরত সোলাইমান আল্লাহর নামের শপথ করিয়া বলেন, আমরা যদি নিজেদের প্রিয় বস্তুর উপর সবর করিতে না পারি তবে অপ্রিয় বস্তুর উপর কেমন করিয়া সবর করিব?

এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার উপর শারীরিক, আর্থিক কিংবা তাহার সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত নাজিল করি এবং সে যখন উত্তম সবর দ্বারা উহা বরদাশত করিয়া লয়, রোজ কেয়ামতে তাহার জন্য দাঁড়িপাল্লা নিযুক্ত করিতে কিংবা তাহার আমলনামা খুলিয়া দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।

অন্য হাদীসে আছে–

انتظار الفرج بالصبر عبادة

অর্থাৎ– "সবরের সহিত স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা এবাদত।" অপর এক হাদীসে আছে, কোন মুসীবতে আপতিত হওয়ার পর বান্দা যখন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠের পর বলে–

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَ اَعْقِبْنِى خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থাৎ– "আয় আল্লাহ! বিপদে আমাকে পুরস্কৃত কর এবং উহার বরাবরে উত্তম বস্তু দান কর।" তখন আল্লাহ পাক এইরূপই করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈলকে বলিলেন, হে জিবরাঈল! আমি যাহার দুই চক্ষু নিয়া নেই, তাহার প্রতিদান কি? জিবরাঈল বলিলেন, আপনি আমাদিগকে যেই বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমরা উহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। এরশাদ হইল, উহার প্রতিদান এই যে, সে সর্বদা

আমার ঘরে থাকিবে এবং আমার দীদার লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, কোন বান্দাকে আমি মুসীবতে নিপতিত করিবার পর সে যখন উহাতে সবর করে এবং যাহারা তাহার খোঁজ-খবর লইতে আসে তাহাদের নিকট বিপদের কথা উত্থাপন না করে, তখন আমি উহার প্রতিদানে তাহার গোশত অপেক্ষা উত্তম গোশত দেই এবং তাহার রক্ত অপেক্ষা উত্তম রক্ত দান করি। যখন তাহাকে আরোগ্য দান করি তখন তাহার কোন রোগ থাকে না, আর যখন মৃত্যু দান করি, তখন আমার রহমতের ছায়ায় লইয়া আসি।

একদা হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! বিপন্ন মানুষ যদি আপনার সন্তুষ্টির আশায় বিপদে সবর করে, তবে উহার প্রতিদান কি? আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইলেন, উহার প্রতিদান হইল, তাহাকে ইমানের পোশাক পরিধান করাইব এবং উহা আর খুলিয়া লইব না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ একবার নিজের খোৎবায় বলেন, আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে নেয়মত দান করিয়া পরে যখন ফিরাইয়া নেন, তখন যদি বান্দা সবর করে তবে উহার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন নেয়মত দান করেন যাহা পূর্বাপেক্ষা উত্তম হয়। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ– সবরকারীগণই বে-হিসাব পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ)-এর নিকট সবরের হাকীকত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকা। তিনি আরো বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে নিজের মর্যাদার অতিরিক্ত প্রত্যাশা করে না। (সূরা যুমার – ১০ আয়াত)

কথিত আছে যে, হযরত শিবলী (রহঃ) যখন কারাগারে বন্দী, তখন কয়েক ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিল। তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমরা আপনার সুহৃদ, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। হযরত শিবলী ঢিল ছুঁড়িয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, তোমরা যদি আমার সুহৃদ হইতে, তবে আমার বিপদের সময় সবর করিতে।

এক বুজুর্গের পকেটে সব সময় একটি কাগজ থাকিত এবং তিনি কিছু সময় পর পর পকেট হইতে ঐ কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া লইতেন। উহাতে

লিখা ছিল–

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا .

অর্থাৎ– আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন। (সূরা তুর – ৪৮ আয়াত)

একবার ফাতাহ মুসেলীর স্ত্রী পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে তাহার পায়ের নখ উল্টাইয়া যায়। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি কষ্ট হইতেছে না? জবাবে তিনি বলিলেন, এই দুর্ঘটনার উপর সবর করিলে যেই ছাওয়াব হইবে, উহার আনন্দের কারণেই আমার কষ্ট অনুভব হইতেছে না।

হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে বলিলেন, তিনটি বিষয় দ্বারা মোমেনের তাক্ওয়া প্রমাণিত হয়– (১) যাহা হাতে আসে নাই উহার উপর উত্তম তাওয়াক্কুল করা, (২) যাহা হাতে আসিয়াছে উহাতে সন্তুষ্ট থাকা, (৩) কোন বস্তু একবার প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরায় উহা হাতছাড়া হইয়া গেলে উহাতে উত্তমরূপে সবর করা।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

من اجلال الله و معرفة حقه ان لا تشكوا وجعك و لا تذكر مصيبتك

অর্থাৎ– তুমি তোমার কষ্টের অভিযোগ করিও না এবং মুসীবতের কথা আলোচনা করিও না– ইহাই আল্লাহর হকের পরিচয়।

একদা এক বুজুর্গ কাঁধে থলী ঝুলাইয়া কি কাজে পথে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি থলীতে হাত ঢুকাইয়া দেখিলেন উহাতে টাকার বেগ নাই। পরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, উহা চুরি হইয়া গিয়াছে, তখন এইরূপ দোয়া করিলেন, যেই ব্যক্তি এই টাকা নিয়াছে, আল্লাহ যেন উহাতে তাহাকে বরকত দেন। সম্ভবতঃ আমার তুলনায় ঐ ব্যক্তিরই এই টাকার প্রয়োজন বেশী ছিল।

এই হইল আল্লাহর পথের পথিকগণের হালাত। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মুসীবতের সময় মানুষ কেমন করিয়া সবরের মর্যাদা লাভ করিবে? ইহা তো মানুষের এখতিয়ারী বিষয় নহে। কারণ অন্তরে মুসীবতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা না থাকার নাম যদি হয় সবর, তবে ইহা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত হইতে পারে না। উহার জবাব হইল– মানুষ সবরকারীদের তালিকা হইতে তখনই বাদ পড়িবে যখন বিপদে চরম হা-হুতাশ প্রকাশ করিয়া স্বীয় মুখমণ্ডলে করাঘাত, পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলা, উঠিতে-বসিতে কেবলই সেই বিপদের উল্লেখ,

নিয়মিত আহারে বিঘ্ন– ইত্যাদি অবস্থা প্রকাশ পাইবে। এই সকল কর্ম মানুষের এখতিয়ারাধীন। কিন্তু সবর করার ক্ষেত্রে এই সকল বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। আল্লাহর পক্ষ হইতে যখন যাহা হয় উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং মুখে উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করিবে না। তাছাড়া পানাহারের নিয়মিত অভ্যাসেও কোন পরিবর্তন করিবে না। মনে করিতে হইবে, হারানো বস্তুটি আমার নিকট আমানত ছিল এবং এক্ষণে মালিক উহা আমার নিকট হইতে ফেরৎ লইয়া গিয়াছেন।

রমীছা উম্মে সুলাইম বর্ণনা করেন, আমার শিশুপুত্রটি যখন ইন্তেকাল করে তখন আমার স্বামী হযরত আবু তালহা গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। আমি মৃতদেহটি ঘরের এক কোণে নিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। উহার কিছুক্ষণ পর আমার স্বামী ঘরে আসিলেন। আমি যথারীতি তাহার সম্মুখে খাবার পরিবেশণ করিলাম। আহারে বসিয়া তিনি অসুস্থ ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সংক্ষেপে বলিলাম, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ সে ভাল আছে। আমার এই মন্তব্যের তাৎপর্য ছিল এই– ছেলেটি অসুস্থ হওয়ার পর তুলনামূলকভাবে সেই রাতেই সর্বাধিক শান্তিতে কাটিয়াছিল। পরে আমি অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিক সাজসজ্জা করিয়া স্বামীর সঙ্গে সয্যাগ্রহণ করিলাম এবং তিনি আমার সঙ্গে সহবাস করিলেন।

অতঃপর আমি স্বামীকে বলিলাম, আমাদের প্রতিবেশীর কাণ্ড দেখুন, সে এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি বস্তু চাহিয়া আনিয়াছিল। এখন মালিক উহা ফেরৎ লইয়া গেলে সে মাতম শুরু করিয়া দিয়াছে। আমার স্বামী হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, প্রতিবেশীটি যদি এইরূপ করিয়া থাকে তবে সে খুব অন্যায় করিয়াছে। এইবার আমি বলিলাম, আপনার ছেলেটি আল্লাহর পক্ষ হইতে ধারস্বরূপ ছিল। আল্লাহ এখন তাহা ফেরৎ লইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করিয়া বলিলেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন"।

পর দিন প্রভাতে তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বিবরণ শুনিয়া আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিলেন, এলাহী! ঐ রাতের ব্যাপারে তুমি বরকত দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসূলের উপরোক্ত দোয়ার বরকতে পরবর্তীতে আমি হযরত আবু তালহার সাতটি সন্তানকে মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত করিতে দেখিয়াছি। এদিকে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে বেহেশতে প্রবেশ করিবার পর তথায় আবু তালহার স্ত্রী

রমীছাকে দেখিয়াছি।

এক বুজুর্গ বলেন, "সবরে জামীল" (উত্তম সবর) হইল, অন্য সকলের সঙ্গে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট না হওয়া। মৃতের জন্য চোখের পানি ফেলিলে সবরকারীদের তালিকা হইতে বাদ পড়িতে হইবে না। কারণ, ইহা মানবের স্বভাবজাত চেতনার দাবী। মানব স্বভাবে আমৃতু ইহার উপস্থিতি অনিবার্য। এই কারণেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকাল হইলে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাদিগকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এরশাদ হইল–

اِنَّ هٰـذِهٖ رَحْمَةٌ وَّ انما يرحم الله من عباده الرحماء

অর্থাৎ– ইহা করুণা, যাহারা করুণা করে, তাহারা আল্লাহ পাকের করুণা প্রাপ্ত হয়।

এদিকে শয়তান মানুষের পিছনে লাগিয়াই আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সে তাহার এই অপতৎপরতা অব্যাহত রাখিবে। তবে মানুষের অন্তরে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ফিকির না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় মানুষ মোখলেছ বান্দাদের মধ্যে গণ্য হয় এবং কোরআনের বাণী অনুযায়ী শয়তানের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে।

সুতরাং কোন অবস্থাতেই এমন কল্পনা করা যাইবে না যে, অন্তরে আল্লাহর ফিকিরও থাকিবে না আবার শয়তানের প্ররোচনা হইতেও নিরাপদ থাকিবে। কারণ শয়তান মানবদেহে রক্ত প্রবাহের মত বিচরণ করিতে থাকে। উহার অবস্থা যেন কোন পাত্রে তরল পদার্থের অবস্থানের মত। যদি কেহ এমন কামনা করে যে, কোন পাত্র হইতে বায়ু নিস্কাষণ করিয়া ফেলা হইবে এবং উহাতে পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থও প্রবেশ করিবে না– ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। বরং ঐ পাত্র হইতে যেই পরিমাণ পানি বাহির করা হইবে, সেই পরিমাণেই উহাতে বায়ু প্রবেশ করিবে। ঠিক তদ্রূপ যেই অন্তর আল্লাহ পাকের ধ্যান ও খেয়াল এবং দ্বীনের ফিকিরে পরিপূর্ণ থাকিবে, সেই অন্তর শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে। আর দ্বীনী ফিকির হইতে যেই পরিমাণ শূন্য হইবে, শয়তানের প্ররোচনাও উহাতে সেই পরিমাণেই ক্রিয়া করিবে এবং শয়তান তাহার সহচর হইবে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ হইতে চোখ ফিরাইয়া লয়, আমি তাহার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করিয়া দেই, অতঃপর সে-ই হয় তাহার সঙ্গী। (সূরা যুখরুফ – ৩৬ আয়াত)

যুবা বয়সে মানুষ যদি দ্বীনের উপর আমল না করে এবং মানুষের অন্তর যদি নেক আমল শূন্য থাকে, তবে এই সুযোগে শয়তান তাহার অন্তরে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িবে এবং উহাতে তা দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়া ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকিবে। কারণ, শয়তান হইল আগুনের তৈরী। আগুন যখন শুষ্ক তৃণের স্পর্শ পায় তখন উহার ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে যুবা বয়সে মানুষের অন্তরে শাহ্ওয়াত ও কুপ্রবৃত্তি বর্তমান থাকা এমন– যেমন আগুনের পক্ষে শুষ্ক তৃণের স্পর্শ পাওয়া। পক্ষান্তরে আগুন যেমন খোরাক তথা শুষ্ক খড়ি না পাইলে নির্বাপিত হইয়া যায়, অনুরূপভাবে মানুষের অন্তরে শাহওয়াত বর্তমান না পাইলে শয়তানও শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

উপরের পর্যালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মানুষের বড় শত্রু হইল কুপ্রবৃত্তি যাহা নফসের সিফাতবিশেষ। এই কারণেই মনসুর হিল্লাজকে তাসাওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা হইল মানুষের নফস। অর্থাৎ মানুষ যদি স্বীয় নফসকে কাজে লাগাইয়া না রাখে, তবে শয়তান উহাকে কাজে লাগাইয়া ফেলিবে। মোটকথা, সবরের হাকীকত হইল– প্রতিটি মন্দ কাজে সবর করা এবং বিশেষতঃ আধ্যাত্ম বিষয়ে সর্বোত্তম সবর করা। এই সবরই হইল স্থায়ী সবর যাহা মৃত্যুর পূর্বে মানুষ হইতে পৃথক হয় না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

সবর হাসিল করার উপায়

ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, যিনি রোগ দিয়াছেন তিনি উহার ঔষধ নির্দেশ করিয়া আরোগ্য দানেরও ওয়াদা করিয়াছেন। সুতরাং সবর যত কঠিনই হউক, এলেম ও আমলের বটিকা দ্বারা উহা হাসিল করা যাইবে। এই সবর এবং উহার প্রতিবন্ধক বিবিধ প্রকার বিধায় উহার চিকিৎসা তথা উহা হাসিল করার উপায়ও বিভিন্ন রূপ। নিম্নে আমরা দৃষ্টান্তসহ উহার কতক পদ্ধতি উল্লেখ করিতেছি।

মনে কর, এক ব্যক্তি ব্যভিচার ও যিনার উত্তেজনা হইতে সবর করিতে চাহিতেছে। এই উত্তেজনা তাহার উপর এমনই প্রবল যে, সে নিজের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখিতে সক্ষম হইলেও দৃষ্টিকে হেফাজত করিতে পারিতেছে না। কিংবা

দৃষ্টির হেফাজত সম্ভব হইলেও নিজের মনকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছে না। মন সর্বদা কেবলই তাহাকে ব্যভিচার ও কামভাবের সহিত জড়াইয়া রাখিতেছে। ফলে সে নিয়মিত এবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার এলাজ ও প্রতিকার এই–

ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, দ্বীনী জযবা ও শাহওয়াতী জযবার মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইতে থাকে। এক্ষণে আমরা যদি উহার এক পক্ষকে জয়ী করিতে চাই, তবে সেই পক্ষকে শক্তি যোগাইতে হইবে এবং অপর পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে। উপরে বর্ণিত উদাহরণে দ্বীনী জযবা হইল কামভাব হইতে নিজেকে হেফাজত করা এবং কামভাবটি হইল শাহ্ওয়াতী জযবা। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা দ্বীনী জযবাকে উহার প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বিজয়ী করিতে চাই তবে দ্বীনী জযবার শক্তিবৃদ্ধি করিয়া উহার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা আবশ্যক। কামপ্রেরণাকে দুর্বল ও শক্তিহীন করার উপায় তিনটি–

(১) অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বিবিধ প্রকার উপাদেয় ও পর্যাপ্ত খাবারই হইতেছে কামোত্তেজনার শক্তির মূল উৎস। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত রোজা রাখার অভ্যাস, ইফতারের সময় হালকা খাবার গ্রহণ এবং কামোত্তেজক খাবার যেমন গোশত ইত্যাদি বর্জন করিতে হইবে।

(২) কামভাব জাগ্রত হওয়ার কোন উপকরণ মওজুদ থাকিলে উহা বর্জন করিতে হইবে। উহার প্রধান উপকরণ হইল দৃষ্টি। কারণ, কুদৃষ্টির ফলেই মন ক্রমে উহার দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং উহা হইতে আত্মরক্ষার উত্তম উপায় হইল এমন নির্জন বাস অবলম্বন যেখানে অবস্থান করিয়া এমন কাহারো উপর নজর পড়ার সম্ভাবনা না থাকে। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْس

অর্থাৎ– "দৃষ্টি হইল ইবলীসের একটি অন্যতম তীর।"

এই তীর সে এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে, চক্ষু বন্ধ করা ব্যতীত উহাকে প্রতিহত করার অন্য কোন ঢাল নাই। সুতরাং মানুষ যখন সুন্দরী নারীদের আনাগোনার স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে, তখন আর এই তীর তাহার গায়ে লাগিবে না।

(৩) মানুষ যেই জিনিস কামনা করে, বৈধ উপায়ে সেই কাম্য বস্তু দ্বারা মনের চাহিদা পূরণ করিয়া লইবে। আলোচিত প্রশ্নে মানুষের কাম্য বস্তু হইল নারী। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বিবাহ দ্বারা বৈধ উপায়ে মনের চাহিদা পূরণ করিবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে মনের চাহিদার যাবতীয় উপকরণ স্ত্রীর মধ্যে পাওয়া যাইবে। অতএব, নিষিদ্ধ পাত্রে গমনের কোন প্রশ্নই আসে না। অধিকাংশ মানুষের

ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি উপকারী ও কার্যকর। এই কারণেই হাদীসে পাকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকার ক্ষেত্রে রোজা রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

মোটকথা, বর্ণিত তিন প্রকার চিকিৎসার খাদ্য নিয়ন্ত্রণের অবস্থাটি যেন আবধ্য জন্তু বা খেপা কুকুরকে খাবার না দেওয়া, যেন উহার শক্তি হ্রাস পাইয়া নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে। দ্বিতীয় চিকিৎসাটি হইল– কুকুরের সম্মুখ হইতে গোশত সরাইয়া রাখা, যেন উহা দেখিতে না পায় এবং চাহিদাও পয়দা না হয়। তৃতীয় চিকিৎসাটি হইল– কুকুরের চাহিদার খাবার সামান্য পরিমাণে দেওয়া, যেন শাসনে সবর করিতে পারে। এদিকে দ্বীনী জযবাকে দুইভাবে শক্তি যোগানো যাইতে পারে–

(১) মনকে মোজাহাদা ও সাধনার উপকারিতা এবং ইহকাল ও পরকালে উহার শুভ পরিণামের প্রতি উৎসাহিত করা। উহার উপায় হইল– সবরের ফজিলত এবং উহার উপকারিতা সম্পর্কে যেই সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে উহা বেশী বেশী পর্যালোচনা করা। যেমন এক রেওয়ায়েতে আছে– কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার পর যদি উহার উপর সবর করা হয়, তবে এই সবরের কারণে আল্লাহ পাকের নিকট ঐ বিনাশপ্রাপ্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক বিনিময় পাওয়া যায়। কেননা, এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিনিময় ঈর্ষণীয় বটে। অর্থাৎ যেই বস্তুটি বিনষ্ট হইয়াছে, উহা দ্বারা মানুষ কেবল জীবনকালেই উপকৃত হইত। কিন্তু উহার উপর সবর করার কারণে যেই 'বিনিময়' পাওয়া যাইবে, উহা দ্বারা মৃত্যুর পর অনন্তকাল উপকৃত হওয়া যাইবে। উহার উদাহরণ যেন এমন লেনদেনের মত, যেই ক্ষেত্রে কোন নিকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিয়া পরবর্তীতে উহার বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু লাভের চুক্তি স্থির হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিকৃষ্ট বস্তুর জন্য আক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই আসে না। বিষয়টা মারেফাতের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ইহা ঈমানের একটি অংশ। এই মারেফাত কখনো শক্তিশালী হয় আবার কখনো হয় দুর্বল। এই মারেফাত শক্তিশালী হইলে দ্বীনী জযবার শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়া উহাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আর উহা দুর্বল হইলে দ্বীনী জযবাও দুর্বল হইয়া পড়ে।

(২) ক্রমে দ্বীনী জযবা দ্বারা শাহওয়াতী জযবাকে পরাভূত করার অভ্যাস গড়িয়া তোলা এবং এই বিজয়ের স্বাদ অনুভব করা। অবশ্য এই বিজয়কে বিরাট কিছু মনে করার বিশেষ কোন কারণ নাই। কারণ, অভ্যাস ও দক্ষতা স্বাভাবিক নিয়মেই আমলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। এই কারণেই যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে যেমন কৃষক, সৈনিক প্রভৃতি তাহারা দরজী, আতর বিক্রেতা, ফকীহ ও সাধু ব্যক্তিগণের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হইয়া থাকে।

উপরে বর্ণিত দুই পদ্ধতির চিকিৎসার মধ্যে প্রথমটির স্বরূপ যেন কোন

কুস্তিগীরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল– তুমি যদি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পার, তবে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় যাদুকরদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা যদি জয়ী হইতে পার, তবে তোমাদিগকে আমার প্রিয়পাত্র বানাইয়া লইব।

দ্বিতীয় চিকিৎসাটি হইতেছে– যেমন কোন বালককে কুস্তিগীর ও সৈনিক বানাইতে চাহিলে শুরু হইতেই তাহাকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করিয়া তোলা যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ এবং শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু যেই ব্যক্তি সবরের সহিত মোজাহাদা ও সাহসই পরিত্যাগ করিয়া বসিবে, তাহার দ্বীনী জযবা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সে কামভাবের উপর জয়ী হইতে পারিবে না। আর যেই ব্যক্তি খাহেশাত ও প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করিতে অভ্যস্ত হইবে, সে নিজের ইচ্ছামত কামভাবকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। মোটকথা, সবরের সকল ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হইবে। সর্বপ্রকার সবর এবং উহার এলাজ ও চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নহে।

মনের বাতেনী হালাতকে দমন করিয়া সুপথে পরিচালিত করা বড় কঠিন কর্ম বটে। উহার উপায় হইল– জাহেরী খাহেশাত তথা বাহ্যিক কামনা-বাসনা সমূলে বর্জন করিয়া নির্জনতা অবলম্বনপূর্বক ধ্যান-মোরাকাবা এবং জিকির-ফিকিরে মনোনিবেশ করা। অন্যথায় মনের শংকা-সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা মনকে দোদুল্যমান অবস্থায় নিপতিত করিবে। সুতরাং এই অবস্থা হইতে নিস্কৃতির একমাত্র উপায় হইল– নিজের বন্ধু-বান্ধব, বিষয়-সম্পদ তথা যাবতীয় জাহেরী-বাতেনী ঘনিষ্ঠতা বর্জন করিয়া নিজের সামর্থ অনুযায়ী নির্জনতা অবলম্বন করা। অতঃপর হিম্মতের সহিত দিল-দেমাগ ও ধ্যান-খেয়ালকে একত্রিত করিয়া উহা কেবল আল্লাহতে নিবেদিত করা। এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই অবস্থাকেই যথেষ্ট মনে না করা– যতক্ষণ না ধ্যানমগ্নতা দ্বারা আধ্যাত্মিকভাবে আসমান-জমিনের সৃষ্টি-রহস্য এবং আল্লাহর মারেফাত-জগতে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে। এই অবস্থা হাসিল করার পর আশা করা যায় শয়তানের প্রতারণার শিকার হওয়ার আশংকা দূর হইবে।

বর্ণিত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন যদি সম্ভব না হয় তবে এই ক্ষেত্রে মুক্তির উপায় হইল, সর্বদা জিকির-ওজিফা, নামাজ-তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা এবং মুহূর্তের জন্যও গাফেল না হওয়া। সেই সঙ্গে মনের উপরও যাতনা উপস্থিত করিবে। কারণ, বাহ্যিক জিকির-ওজিফা দ্বারা মন আল্লাহতে নিবিষ্ট হয় না। উহার জন্য বরং বাতেনী ফিকির আবশ্যক। এই সকল বিষয় সম্পন্ন হওয়ার পর কেবল মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার ফিকিরই অন্তরে অবশিষ্ট থাকিবে। অবশ্য এই

মোজাহাদার ক্ষেত্রে গোটা সময়ের মধ্যে এমন কিছু অবস্থাও সৃষ্টি হইবে যাহা জিকির-ওজিফার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। যেমন– রোগ-ব্যধি, কোন মানুষ কর্তৃক উৎপীড়ন, কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী দ্বারা বিঘ্নসৃষ্টি কিংবা যেই ব্যক্তি আহার-পানীয় ইত্যাদির যোগান দেয় তাহার সঙ্গে সাক্ষাত ইত্যাদি। তা ছাড়া নিজের আহার-পোশাক ও জরুরী আসবাব যদি নিজেই যোগাড় করা হয় তবে উহার জন্যও একটি সময় বাহির করিতে হয়। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম ব্যতীত অবশিষ্ট সময়ে অন্তর সাফ থাকিবে বটে। অবশ্য এইভাবে দীর্ঘ দিন মোজাহাদা করার পরও হয়ত আধ্যাত্ম বিষয়ে একশত ভাগের এক ভাগও সাফল্য আর্জিত হইবে না। অর্থাৎ উহার অবস্থা যেন রিজিক ও শিকারের মত। অনেক সময় দেখা যায় সামান্য মেহনতের পরই প্রচুর রিজিক ও বড় শিকার হাতে আসে। আবার অনেক সময় দীর্ঘ মেহনতের পরও খুব সামান্যই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টার কিছুমাত্র দখল নাই। এমন নহে যে, চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরই পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হইতে হইবে। মানুষের করণীয় কেবল এতটুকু যে, নিজেকে আল্লাহর আকর্ষণের উপযুক্ত বানাইয়া রাখা। উহার উপায় হইল– যেই সকল বিষয় মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে উহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া। কারণ উপরের আকর্ষণ তখনই ফলোদয় হইবে, যখন নিম্নের আকর্ষণ কর্তন করিয়া দেওয়া হইবে।

রূহানী জগতের বিষয়াদির যাবতীয় আসবাব হইল আসমানী। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

অর্থাৎ– "আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সকল কিছু।"
(সূরা যারিয়াত ২২ আ:)

আল্লাহর আকর্ষণ ও তাঁহার মারেফাত অপেক্ষা বড় নেয়মত আর কি হইতে পারে? ঊর্ধজগতের কার্যাবলী আমাদের নজর হইতে অদৃশ্য। আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে, তিনি কখন আমাদের উপর রিজিকের সামান নাজিল করিবেন। আমাদের কর্তব্য কেবল পাত্রটি প্রস্তুত করিয়া আল্লাহর রহমতের জন্য যথাযথভাবে অপেক্ষা করিতে থাকা। যেমন জমির আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া হাল চাষের পর উহাতে বীজ বপন করা হইল, কিন্তু যতক্ষণ বৃষ্টি বর্ষণ না হইবে ততক্ষণ এই প্রচেষ্টা ফলোদয় হইবে না। অথচ কৃষকের এই বিষয়ে কিছুই জানা নাই যে, আকাশ হইতে কখন বৃষ্টি বর্ষণ হইবে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রহমতের উপর এই ভরসা আছে যে, কোন বৎসরই তিনি বৃষ্টিশূন্য রাখেন না, এই বিশ্বাস ও একীনের প্রেক্ষিতেই এতসব মেহনত বরদাশত করা হয়।

অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও কোন বৎসর ও মাস তাঁহার রহমত ও করুণা বর্ষণ হইতে বিরত থাকে না। সুতরাং বান্দার করনীয় হইল– নিজের অন্তরকে যাবতীয় শাহওয়াত ও কামনা-বাসনার আবর্জনা হইতে পরিষ্কার করিয়া আশার বীজ বপনের পর আল্লাহর রহমতের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকা। আকাশে সকল মৌসুমেই মেঘ দেখা দিতে পারে কিন্তু বর্ষা মৌসুমের মেঘ দ্বারা যেমন বৃষ্টি বর্ষণের অধিক আশা করা হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহর সেই সকল দান দ্বারা রহমতের অধিক আশা করা যাইতে পারে।

হযরত জোনায়েদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়া ত্যাগ করিয়া পরকালে গমন করা সহজ, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মোকাবেলায় সৃষ্টিকে ত্যাগ করা বড় কঠিন। তদপেক্ষা কঠিন হইল স্বীয় নফসকে উপেক্ষা করিয়া আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া। আরো কঠিন হইল আল্লাহর প্রশ্নে সবর করা। এই বক্তব্যে প্রথমতঃ তিনি নফসের মোকাবেলায় সবরের কাঠিন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর সৃষ্টিকে ত্যাগ করার কাঠিন্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের আত্মা ও নফসের সহিত যতকিছুর সম্পর্ক রহিয়াছে উহার মধ্যে সর্বাধিক কঠিন ও মারাত্মক সম্পর্ক হইল সৃষ্টির সহিত সম্পর্ক এবং দুনিয়ার মোহাব্বত। উহার কারণ হইল– ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মোহ। মানুষের নিকট এই নেতৃত্বের মোহ এমনই মোহনীয় যে, দুনিয়ার সকল কিছু অপেক্ষা উহার বাসনাই অধিক প্রবল।

আসলে মানুষের অন্তরে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাসনা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এই ক্ষেত্রে মানুষ এমন একটি বিষয় কামনা করে যাহা আল্লাহ পাকের সিফাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। উহার নাম হইল 'রবুবিয়্যাত'। মানুষের অন্তরে এই রবুবিয়্যাত কাম্য ও প্রিয় হওয়ার কারণ হইল, রবুবিয়্যাতের সাথে উহার সাদৃশ্যতা রহিয়াছে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

অর্থাৎ– বলিয়া দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত।
(সূরা বনী ইসরায়ীল – ৮৫ আয়াত)

আসলে মানব হৃদয়ে এই রবুবিয়্যাত কাম্য ও প্রিয় হওয়া কোন মন্দ বিষয় নহে। বরং এই কারণে উহার নিন্দা করা হয় যে, মানুষের অন্তরে উহা উদয় হওয়ার পর শয়তান মরদূদ মানুষকে ধোকা দিয়া গোমরাহ করিয়া ফেলে। অন্যথায় এই রবুবিয়্যাত কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে; বরং উহা পারলৌকিক সাফল্যের কারণ হইতে পারে। কারণ, রবুবিয়্যাত চির অক্ষয় ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সিফাত। সুতরাং বান্দা যদি উহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ কোন সিফাতের প্রত্যাশা করে তবে উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে– বান্দা এমন অক্ষয় জীবন কামনা করিতেছে যার কোন বিনাশ নাই; সে এমন ইজ্জত লাভ করিতে চাহিতেছে,

যেখানে জিল্লতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সে এমন নিরাপত্তা কামনা করিতেছে, যেখানে খওফ ও ভয়ের কোন নাম নিশানাও নাই; সে এমন জীবনোপকরণ লাভের অভিলাষী, যেখানে আর কোন দিন অভাব তাহাকে স্পর্শ করিবে না; বান্দা এই ক্ষেত্রে এমন সৌভাগ্যশালী হওয়ার প্রত্যাশী, যেখানে আর কোন দিন সে অসুস্থ হওয়ার আশংকা থাকিবে না। এই সমস্ত বিষয়ই হইল রবুবিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত, যাহা পারলৌকিক জীবনের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং কোন মানুষ যদি ইহা কামনা করে, তবে কি কারণে ইহা নিন্দনীয় হইবে? বরং বান্দার পক্ষে এমন একটি জগৎই কামনা করা কর্তব্য যাহা আর কোন দিন তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

এই জগত তথা মানুষের বসবাসের আবাস দুই প্রকার। প্রথমতঃ সেই জগৎ যাহা অস্থায়ী ও বিলীয়মান। এই জগতে মানুষ বিবিধ দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবতের শিকার হয়। কিন্তু ইহা নগদ ও খুব তাড়াতাড়ি মানুষের হস্তগত হয়। ইহার নাম দুনিয়া। মানুষের বসবাসের জন্য আরো একটি জগত আছে, যাহা অনন্ত ও স্থায়ী। এখানে মানুষ কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ও কদর্যতার স্পর্শে আসিবে না। কিন্তু মানুষ এই জগতের অধিকারী হইতে কিছু বিলম্ব হইবে। ইহার নাম আখেরাত। এদিকে মানুষ যেহেতু নগদ ও দ্রুতপ্রাপ্তিতে অধিক উৎসাহী এবং বাকীর তুলনায় নগদকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে; সুতরাং শয়তান মানুষের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া নগদ দুনিয়াকে তাহাদের সম্মুখে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়া ধরে এবং বিবিধ কৌশলে আখেরাতের প্রতি তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করার জাল বিস্তার করে। শয়তানের এই প্রতারণার শিকার হইয়া দুনিয়াতে লিপ্ত হওয়ার পর পরকালের সুখের প্রত্যাশী হওয়া কোনক্রমেই সুস্থ বিবেকের কর্ম হইতে পারে না। হাদীসে পাকে এই শ্রেণীর লোকদিগকেই নির্বোধ বলা হইয়াছে। সুতরাং যাহাদের পক্ষে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ লাভ করার সৌভাগ্য না হয়, তাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হইয়া অস্থায়ী দুনিয়ার সুখ-ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাক যাহাকে পরকালের সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করেন, সেই ব্যক্তি নিজেকে শয়তানের ফাঁদ হইতে রক্ষা করিয়া আখেরাতের পথে অগ্রসর হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ

অর্থাৎ– কখনো না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (সূরা ক্বিয়ামাহ – ২০-২১ আয়াত)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا

অর্থাৎ– নিশ্চয় ইহারা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখে। (সূরা দাহার – ২৭ আয়াত)

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ– অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তাহার তরফ হইতে আপনি মুখ ফিরাইয়া নিন। (সূরা নাজম – ৩০-২৯ আয়াত)

মোটকথা, পবিত্র কোরআনসহ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং অপরাপর আসমানী কিতাবসমূহ মূলতঃ মানুষকে চিরস্থায়ী পরকালের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্যেই নাজিল হইয়াছে, যেন মানুষ ইহকাল-পরকাল তথা উভয় জগতেই বাদশাহী হালাতে কাটাইতে পারে। দুনিয়ার বাদশাহীর মর্ম হইল– অস্থায়ী জীবনে যুহদ ও সংসার-অনাসক্তি অবলম্বনপূর্বক যেন অতি সামান্যতেই তুষ্ট থাকে এবং পারলৌকিক বাদশাহীর তাৎপর্য হইল– মানুষ যেন আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিয়া এমন চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে, যাহা আর কোন দিন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না। মানুষ যেন পার্থিব জীবনের তুচ্ছ মোহ ত্যাগ করিয়া এমন সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করে যেখানে আর কোন দিন অপমাণিত হইতে হইবে না। পরকালের সেই অন্তহীন জীবন এবং সেই জীবনের অফুরন্ত নাজ-নেয়মত মানুষের চর্মচক্ষু হইতে এমনভাবে গোপন রাখা হইয়াছে যে, মানুষ উহার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত নহে। শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে অস্থায়ী দুনিয়ার ভোগবিলাসের দিকে আহবান করিতেছে। কারণ, সে ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, মানুষকে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট করিতে পারিলে তাহাদের হাত হইতে আখেরাত ছুটিয়া যাইবে। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাত যেন এমন দুইজন সতীন যাহাদের একত্র সহাবস্থা অসম্ভব বটে। একজনের আগমনে অপরজনের অন্তর্ধান অবস্যম্ভাবী।

যুহদ ও সংসার বিরাগকে এই কারণে বাদশাহী বলা হইয়াছে যে, মানুষ উহার ফলে ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে বশ করিয়া উহার মালিক হইয়া যায়। এই পর্যায়ে মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, অতঃপর তাহার যাবতীয় কামনা-বাসনা দ্বীনের অনুগত হইয়া যায়। বস্তুতঃ ইহাই মানব জীবনের চরম সাফল্য এবং ইহাকেই বাদশাহী বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মানুষ নিজেই যদি প্রবৃত্তির বশ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সে যেন উদর ও কাম-প্রবৃত্তির গোলাম হইয়া চতুষ্পদ জানোয়ারে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তাহার গলদেশে প্রবৃত্তি ও শাহ্ওয়াতের রশি বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং কাম-প্রবৃত্তি তাহাকে যথেচ্ছা টানিয়া ফিরাইতে থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল– মানুষ এমনই ধোকায় পড়িয়া

আছে যে, কাম-প্রবৃত্তির গোলাম হওয়ার পর উহাকেই বাদশাহী সাব্যস্ত করিয়া মনে করিতেছে, উহার সুবাদেই সে রবুবিয়্যাত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত। এই কারণেই জনৈক যাহেদ বুজুর্গ এক বাদশাহকে বলিয়াছিলেন, তোমার রাজত্ব অপেক্ষা আমার রাজত্ব অনেক বড়। ঘটনাটি এইরূপ–

একদা এক বাদশাহ জনৈক জাহেদকে বলিলেন, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে আমাকে বলুন। বুজুর্গ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, আমার প্রয়োজনের কথা তোমার নিকট কি বলিব, তোমার রাজত্ব অপেক্ষা আমার রাজত্ব অনেক বড়। বাদশাহ সবিস্ময়ে উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে বুজুর্গ বলিলেন, তুমি এমন এক বস্তুর গোলাম হইয়া আছ, যেই বস্তুটি আমার গোলাম। বাদশাহ পুনরায় এই কথার তাৎপর্য জানিতে চাহিলে বুজুর্গ বলিলেন, তুমি তোমার কাম-প্রবৃত্তি, ক্রোধ, উদর ইত্যাদির গোলাম। আর আমি এই সবের মালিক এবং উহারা আমার গোলাম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংসার-অনাসক্ত আল্লাহগত প্রাণ হওয়া তথা যুহদ-ই হইল দুনিয়ার বাদশাহী। এই বাদশাহী হাসিল করিতে পারিলেই পরকালের বাদশাহী লাভ করা যাইবে। যেই ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়িয়া দুনিয়ার পিছনে লিপ্ত হইবে সে দুনিয়াতেও বরবাদ হইবে এবং আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর যেই ব্যক্তি সরল-সোজা পথে কায়েম থাকিবে উভয় জাহানেই সে কামিয়াব হইবে।

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা প্রকৃত বাদশাহী, রবুবিয়্যাত ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে ইহাও জানা গেল যে, শয়তান এই সকল বিষয়ে কেমন করিয়া মানুষকে ধোঁকা দিয়া বিপথগামী করিতেছে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পর পার্থিব বিষয়-সম্পদ হইতে বিমুখ হওয়া এবং দুনিয়ার মাল-ছামানা না হওয়ার উপর সবর করা সহজ হইয়া গেল। কারণ, যেই ব্যক্তি পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিবে, সে নগদ দুনিয়াতেই বাদশাহী লাভ করিবে এবং পরকালের বাদশাহীরও প্রত্যাশা করিবে। আর যেই ব্যক্তি পার্থিব বিষয়-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হওয়া অবস্থায় এই সকল বিষয়ে অবগত হইবে, এমন ব্যক্তির এলাজ ও চিকিৎসার জন্য নিছক এই 'অবগতি' যথেষ্ট হইবে না। বরং তিন উপায়ে এই শ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা করিতে হইবে–

(১) পার্থিব বিষয়-সম্পদের স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া। কারণ, কাম-প্রবৃত্তির উপকরণ সমূহ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূর করার ইহাই উত্তম উপায়।

(২) আপন নফসকে অভ্যাসের বিপরীত আমলের পাবন্দ করার চেষ্টা করা। উদাহরণ স্বরূপ– যদি পরিপাটি ও সাজ-সজ্জার অভ্যাস থাকে, তবে নিয়মিত কিছু নির্দিষ্ট সময় উহা বর্জন করিয়া নিজেকে একেবারে সাধারণ ও হীন অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইবে। দামী ও মূল্যবান পোশাক ত্যাগ করিয়া ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরিধান করিবে। অর্থাৎ আহার-নিদ্রা, লেবাস-পোশাক, বাসস্থানসহ জীবনযাত্রার অপর সকল ক্ষেত্রেই আড়ম্বর ও লৌকিকতা পরিহার করিয়া নেহায়েত "জরুরত পরিমাণ" এর উপর অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিবে এবং ক্রমে পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করিতে থাকিবে। আর সর্বদা এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে, যেন এই নূতন অভ্যাসগুলি স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। কারণ, চিকিৎসার নিয়মই হইল, যেই স্বভাবের কারণে অনিষ্ট সৃষ্টি হইয়াছে রোগীকে উহার বিপরীত স্বভাবে অভ্যস্ত করিয়া তোলা।

(৩) আত্মা ও স্বভাবের এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদা ধীর গতি অবলম্বন করিবে। কারণ, স্বভাব বড় ভয়ানক বস্তু। এক দিনেই উহার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় না। সুতরাং এমন চেষ্টা করিবে না যে, এক দিনেই নিজেকে একেবারে অপমানিত ও জলীল অবস্থায় দাঁড় করাইয়া সহসাই পূর্ণাঙ্গ যাহেদ বনিয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে এই ধরনের তাড়াহুড়া দ্বারা বিশেষ কোন সুফল অর্জিত হয় না। সুতরাং দিনে দিনে ক্রমে একটি দুইটি স্বভাব ত্যাগ করিয়া এবং একবার যাহা ত্যাগ করা হইল পরবর্তীতে উহার উপর মজবুত থাকার চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ একদিন গোটা স্বভাবেরই আমূল পরিবর্তন হইয়া যাইবে। ইতিপূর্বে যাহা প্রিয় ছিল এক্ষণে উহাই অপ্রিয় মনে হইতে থাকিবে এবং কোন কিছু না পাইলে উহার উপর সবর করাও সহজ হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোকর

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে শোকরকে জিকিরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার জিকিরের মাহত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে–

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

অর্থাৎ– "আল্লাহর জিকির অত্যন্ত মহান।" (সূরা আনকাবুত — ৪৫ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ *

অর্থাৎ– "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।; অকৃতজ্ঞ হইও না।" (সূরা বাক্বারাহ — ১৫২ আয়াত)

এখানে আল্লাহর জিকির ও স্মরণ-এর মাহত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। তো এমন মহৎ বিষয়ের সঙ্গে 'শোকর'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ দ্বারা শোকরের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়।

আরো এরশাদ হইয়াছে–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

অর্থাৎ– "তোমরা যদি শোকর কর এবং ঈমান রাখ, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি দিয়া কি করিবেন?" (সূরা নিসা — ১৪৭ আয়াত)

অন্য এক আয়াতে আছে–

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ *

অর্থাৎ– "আমি শোকরকারীদিগকে প্রতিদান দিব।(সূরা আলে-ইমরান — ১৪৫ আয়াত)

অভিশপ্ত শয়তানের উক্তিটিও কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। সে বলিয়াছিল–

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ *

অর্থাৎ– "আমিও অবশ্য তাহাদের জন্য আপনার সরল পথে বসিয়া থাকিব।" (সূরা আ'রাফ — ১৬ আয়াত)

কোন কোন মোফাস্সিরের মতে আয়াতে উদ্ধৃত "সিরাতে মুসতাকীম" দ্বারা এখানে শোকরকারীদের পথ বুঝানো হইয়াছে। আসলে শোকর হইল একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। এই কারণেই শয়তান মানুষের না শোকরীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে–

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ *

অর্থাৎ– "আপনি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবেন না।" (সূরা আ'রাফ — ১৭ আয়াত)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ *

অর্থাৎ– "আমার স্বল্প সংখ্যক বান্দা শোকরকারী।" (সূরা ছাবা — ১৩ আয়াত)

শোকরের কারণে নেয়মত বৃদ্ধি হওয়ার বিষয়টিকে আল্লাহ পাক নিশ্চিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার সঙ্গে অপর কোন শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই। যেমন বলা হইয়াছে–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

অর্থাৎ– "তোমরা যদি আমার শোকর কর তবে অবশ্যই আমি নেয়মত বৃদ্ধি করিয়া দিব।"

অথচ ধনবান করা, দোয়া কবুল করা, রুজি দেওয়া, ক্ষমা করা, তওবা কবুল করা ইত্যাদি নেয়মত সমূহের ক্ষেত্রে "আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হওয়া" এর শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَآءَ

অর্থাৎ– আল্লাহ ইচ্ছা করিলে স্বীয় ফজল ও কৃপায় ভবিষ্যতে তোমাদিগকে ধনবান করিয়া দিবেন। (সূরা আন'আম — ৪০ আয়াত)

দোয়া কবুল প্রসঙ্গে এরশাদ হইয়াছে–

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ

অর্থাৎ– অতঃপর তিনি যদি চাহেন তবে উন্মুক্ত করিয়া দেন যাহার জন্য তোমরা দোয়া কর।

রিজিকের প্রশ্নে বলা হইয়াছে–

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ– তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিজিক দান করেন।

(সূরা আলে ইমরান – ২৭ আয়াত)

ক্ষমার কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ হইয়াছে–

وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ– "শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।"

(সূরা নিসা – ৪৮ আয়াত)

অনুরূপভাবে তওবার ক্ষেত্রেও বলা হইয়াছে– তিনি যাহাকে ইচ্ছা তওবা [illegible]ব করেন।

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, শোকর একটি উত্তম বিষয় এবং ইহার সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছাকে শর্ত করা হয় নাই। বরং শোকরের সঙ্গে নেয়মত বৃদ্ধির নিশ্চিত ওয়াদা করা হইয়াছে। কারণ, শোকর হইল রবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই আল্লাহ পাক নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন–

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক শোকরওয়ালা এবং সহনশীল।

তাছাড়া বেহেশতবাসীদের প্রথম বা[illegible] হইবে শোকর। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ

অর্থাৎ– বেহেশতবাসীগণ বলিবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন। (সূরা যুমার – ৪৭ আয়াত)

পবিত্র হাদীসেও শোকরের বহু ফজিলত উল্লেখ আছে। এক হাদীসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

الطَّاعِمُ الشَّاكِرِ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ– যে আহার করে এবং শোকর করে, সে সবরকারী রোজাদারের মত।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর

খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আপনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক বিস্ময়কর যেই অবস্থাটি দেখিয়াছেন তাহা আমাকে বলুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) চোখের পানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, তাঁহার কোন্ অবস্থাটি বিস্ময়কর ছিল না? অতঃপর তিনি বলিলেন, এক রাতে তিনি আমার নিকট বিছানায় আসিলেন কিংবা লেপের নীচে আমার সঙ্গে শয়ন করিলেন। এক পর্যায়ে তাঁহার দেহ মোবারক আমার দেহ স্পর্শ করিল। এই সময় তিনি ফরমাইলেন, হে আবু বকরের বেটী! আল্লাহর এবাদতের জন্য আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার সঙ্গেই থাকিতে চাই; তবে আমি আপনার মর্জির অনুগত। আমি তাঁহাকে অনুমতি দিলাম। তিনি বিছানা ত্যাগ করিয়া পানির পাত্রের নিকট তাশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে ওজু করিলেন এবং খুব বেশী পানি ব্যবহার করিলেন না। অতঃপর নামাজে দাঁড়াইয়া এমনভাবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার বক্ষদেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর রুকু, সেজদা এবং দুই সেজদার মধ্যখানেও চোখের পানি ফেলিলেন। তিনি এমনিভাবে ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল আসিয়া ফজরের নামাজের কথা জানাইয়া গেলে আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক তো আপনার অগ্র-পশ্চাতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উহার পরও আপনি এইভাবে কাঁদিতেছেন কেন? আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরকারী বান্দা হইব না?

এক পয়গম্বরের ঘটনা। পথ অতিক্রমের সময় একটি ছোট পাথর হইতে পানি বাহির হইতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

এই সময় আল্লাহ পাক সেই পাথর-খণ্ডকে বাকশক্তি দান করিলে সে বলিয়া উঠিল, হে আল্লাহর পয়গম্বর! যেই দিন হইতে আমি আল্লাহ পাকের এই এরশাদ শুনিয়াছি যে, 'দোজখের ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর' সেই দিন হইতেই আমি ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি। পাথরের এই উক্তি শুনিয়া সেই পয়গম্বর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! এই পাথরকে তুমি আগুন হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ পাক পয়গম্বরের দোয়া কবুল করিলেন। অতঃপর পয়গম্বর পাথরকে এই কথা জানাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার বহু দিন পর পয়গম্বর পুনরায় সেই পাথর অতিক্রমের সময় দেখিতে পাইলেন, সেই পাথরটি আগের মতই রোদন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমি কি কারণে কাঁদিতেছ? পাথরটি জবাব দিল,

পূর্বের কান্নার কারণ ছিল আল্লাহর আজাবের ভয়। আর এখন কাঁদিতেছি আজাব হইতে নাজাত লাভের শোকর ও আনন্দে।

উপরে একটি পথরের ক্রন্দনের ঘটনা উল্লেখ করা হইল। আসলে মানুষের অন্তরও পাথরের মত কিংবা পাথর অপেক্ষা আরো কঠিন। সুতরাং কান্না ব্যতীত প্রস্তরতুল্য অন্তরের কাঠিন্য দূর হইবে না। এই কান্না ভয় ও শোকর উভয় হালাতেই আবশ্যক।

এক হাদীসে আছে– কেয়ামতের দিন ঘোষণা দিয়া বলা হইবে, আল্লাহর বেশী বেশী প্রশংসাকারীগণ দণ্ডায়মান হউক। এই ঘোষণার পর একটি দল দণ্ডায়মান হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আল্লাহর বেশী প্রশংসাকারী কাহারা? এরশাদ হইল, যাহারা সর্বাস্থায় আল্লাহর শোকর করে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যাহারা সুখে ও দুঃখে আল্লাহর শোকর করে। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে– শোকর হইল আল্লাহর চাদর। ইহা দ্বারাই শোকরের গুরুত্ব ও ফজিলত অনুমান করা যায়। তাছাড়া হযরত আইউব (রাঃ)-এর উপর আগত ওহীর মাধ্যমেও শোকরের বহু ফজিলত বিবৃত হইয়াছে।

শোকরের সংজ্ঞা

ছালেকীন বা যাহারা আল্লাহর পথের পথিক তাহাদের মনজিল সমূহের একটি হইল শোকর। এলেম, হাল ও আমল এই তিনটি বিষয় দ্বারা গঠিত হয় শোকর। তবে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে এলেমই হইল আসল। এই এলেম হইতে পয়দা হয় হাল এবং হাল হইতে আমল। এলেমের উদ্দেশ্য হইল এই বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা যে, যাবতীয় নেয়মত আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতেই আসে। হাল হইল আল্লাহর দেওয়া নেয়মতের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর আমল হইল যাহা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ পাকের নিকট যাহা প্রিয় উহাতে অবিচল ও কায়েম থাকা। অবশ্য এই আমল মানুষের অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জিহবার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। নিম্নে আমরা এই বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করিব, যেন শোকরের সংজ্ঞা এবং উহার হাকীকত বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়।

শোকরের পরিচয় এবং উহার সংজ্ঞা সম্পর্কে যত বিবরণ উক্ত হইয়াছে উহার কোনটিতেই শোকরের পূর্ণাঙ্গ অর্থের বিকাশ ঘটে নাই। আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রধান বিষয় এলেম হইল তিনটি বিষয়ের এলেম। (১) খোদ নেয়মতকে জানা। (২) নেয়মত যে তাহার জন্য 'নেয়মত' এই বিষয়ে জানা। (৩) যিনি নেয়মত দান করেন, সেই নেয়মত দাতার জাত ও সিফাত জানা। তবে ইহা কেবল

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে যেই এলেম আবশ্যক তাহা হইল– এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এলেম থাকা যে, যাবতীয় নেয়মত কেবল আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতেই আসে, যাহাদের মাধ্যমে উহা আসে তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে আদিষ্ট এবং তাহারা স্ব স্ব স্থানে ঐ দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য। এই এলেম ও মারেফাত আল্লাহর পবিত্রতা ও তাওহীদ হইতেও বড়। কারণ, ঐ দুইটি বিষয় ইহার মধ্যেও নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ঈমানের মারেফাত সমূহের প্রাথমিক স্তর হইল আল্লাহকে পাক জানা। যখন ইহা জানা হইবে যে, এক আল্লাহর সত্তা পাক ও পবিত্র; তখন এই বিষয়েও মারেফাত হাসিল হইবে যে, পবিত্র সত্ত্বা কেবল একটিই। অর্থাৎ আল্লাহর একক পবিত্র সত্ত্বার এলেমই হইল তাওহীদ। উহার পর স্বাভাবিকভাবে এই এলেমও হইবে যে, এই পৃথিবীতে যাহাকিছু বিদ্যমান আছে উহার সবই ঐ একক সত্ত্বা হইতে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে এই বিষয়টিই প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি "সোবহানাল্লাহ" পাঠ করিবে, তাহার দশটি নেকী হইবে। যেই ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করিবে, তাহার নেকী হইবে বিশটি। আর যেই ব্যক্তি "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করিবে, তাহার ত্রিশটি নেকী হাসিল হইবে। আর এই নেয়মত তখনই পূর্ণ হইবে যখন ক্রিয়াকর্মে কোনরূপ শিরকের সংশ্লিষ্টতা না থাকিবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করা যাইতে পারে।

মনে কর, কোন বাদশাহ এক ব্যক্তিকে কিছু নেয়মত দান করিল। এখন সেই ব্যক্তি যদি ঐ নেয়মত প্রাপ্তির ব্যাপারে উহার বাহক কিংবা বাদশাহর উজীরেরও উহাতে দখল আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে এই ক্ষেত্রে সে যেন ঐ নেয়মত প্রাপ্তির ব্যাপারে বাদশাহর সঙ্গে অপরকেও শরীক করিল। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে সে যেন বাদশাহকে উহার নিরঙ্কুশ দাতা হিসাবে স্বীকার করিল না। বরং সে বিশ্বাস করিল, ঐ নেয়মত কিছু বাদশাহর পক্ষ হইতে এবং কিছু উজীর কিংবা অপর কাহারো পক্ষ হইতে পাইয়াছে। সুতরাং তাহার নেয়মত প্রাপ্তির আনন্দও উভয়ের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে এবং এককভাবে উহা বাদশাহর উপর নিবদ্ধ হইবে না। অবশ্য সে যদি এইরূপ বিশ্বাস করে যে, প্রাপ্ত নেয়মতটি তাহার নিকট হস্তগত হওয়ার ব্যাপারে উজীর বা অপর কাহারো হস্তক্ষেপ থাকিলেও মূলতঃ বাদশাহর হুকুমের কারণেই সে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে এই ক্ষেত্রে শিরক হইবে না এবং পূর্ণাঙ্গ শোকরেও কোন ত্রুটি হইবে না। কারণ, এখানে নেয়মতের বাহক কিংবা উজীরের শোকর করা হয় নাই। অনুরূপভাবে বাদশাহর উজীরকে যদি এইরূপ মনে করা হয় যে, বাদশাহর হুকুমের কারণেই সে বাধ্য হইয়া ঐ নেয়মত তাহার নিকট আনিয়া দিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে

তাহার কোন এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিলে তাহাকে কিছুই দিত না– তবে এই ক্ষেত্রেও শিরক হইবে না।

যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভ করিবে এবং তাঁহার কর্মসমূহকে চিনিবে, সে ইহা জানিতে পারিবে যে, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সবই তাঁহার হুকুমের অনুগত। যেমন লেখকের হাতের কলমটি সম্পূর্ণভাবেই লেখকের ইচ্ছার অধীন, সে আপন ইচ্ছাতে কিছুই লিখিতে কিংবা কোন হুকুম জারী করিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর কোন নেয়মত যদি অপর কাহারো মাধ্যমে হস্তগত হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, ঐ নেয়মতটি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতে সে আল্লাহর পক্ষ হইতে বাধ্য ছিল। আল্লাহ পাক তাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন যে, এই বস্তুটি অমুকের হাতে পৌছাইয়া দেওয়াতেই আমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। অর্থাৎ, অন্তরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পর সেই কাজটি না করার সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কোন মানুষ অপর কাহাকেও কিছু প্রদান করার তাৎপর্য হইল– আসলে ইহা নিঃশর্ত কোন দান নহে। বরং উহার মাধ্যমে নিজের কোন লাভ ও কল্যাণের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আশাবাদী হওয়ার পরই অপরকে কিছু প্রদান করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আসল দাতা সেই মহান আল্লাহ, যিনি ঐ বস্তুটির বাহকের অন্তরে উহা বহন করার ফজীলত ও কল্যাণের একীন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে সে বহন করিয়া অপরের নিকট পৌছাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি মানুষ যখন এইভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, তখন এককভাবে আল্লাহ পাকের শোকর করিতেও সক্ষম হইবে। আর বিষয়টিকে এইভাবে জানার কারণেই মানুষ আল্লাহর শোকরকারী হিসাবে গণ্য হইবে। যেমন– হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিয়াছিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! তুমি আদমকে নিজের হাতে সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে কত নেয়মত দান করিয়াছ; তিনি কেমন করিয়া তোমার শোকর আদায় করিয়াছেন? আল্লাহ জাল্লাশানুহু এরশাদ ফরমাইলেন, আদম সকল নেয়মতকে একমাত্র আমারই পক্ষ হইতে বিশ্বাস করিয়াছে। এই বিশ্বাস এবং আমার নেয়মতকে এইভাবে জানা-ই ছিল তাহার শোকরগুজারী। অর্থাৎ– শোকরগুজারীর মূল কথা হইল– "সকল নেয়মতই আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে" ইহা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। এই বিষয়ে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নেয়মতও চিনিতে পারিল না এবং নেয়মতদাতার পরিচয় লাভ করিতেও ব্যর্থ হইল। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল কেবল বাহ্যিক দাতার পরিচয়ে তুষ্ট না হইয়া বরং প্রকৃত দাতার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। অন্যথায় এই পরিচয় ও এলেমে ত্রুটির কারণে হালেও ত্রুটি আসিবে এবং হাল ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে আমলও ত্রুটিযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইল হাল। ইহা এলেম তথা নেয়মতের মারেফাত ও পরিচয় লাভের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অর্থাৎ, বিনয়-বিনম্রতার সহিত নেয়মতদাতার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। এলেমের মত ইহাও একটি স্বতন্ত্র শোকর বটে। তবে এই শোকর তখনই সম্পন্ন হয় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যথাযথভাবে উহার শর্তসমূহও পালন করে। শর্ত হইল– কেবল নেয়মতদাতার উপরই সন্তুষ্ট হইতে হইবে– নেয়মতের প্রতি নহে। বিষয়টা একটু জটিল বটে। নিম্নে একটা উদাহরণের মাধ্যমে উহাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করিব।

মনে কর, কোন বাদশাহ সফরে যাত্রা করার সময় এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া প্রদান করিল। এখন সেই ব্যক্তি ঘোড়া পাওয়ার পর তিন কারণে আনন্দিত হইতে পারে।

(১) কেবল ঘোড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যে, ইহা সফরের হালাতে আরোহণযোগ্য একটি উপকারী সম্পদ। এই ধরনের সন্তুষ্ট সেই ব্যক্তিই হইবে– বাদশাহর প্রতি যার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই এবং ঘোড়া লাভ করাই যার আসল উদ্দেশ্য। এমনকি এই ঘোড়াটি যদি সে বনে বিচরণ অবস্থায় প্রাপ্ত হইত, তবে সেই ক্ষেত্রেও সে এই পরিমাণই খুশী হইত।

(২) কেবল ঘোড়া পাওয়ার কারণেই সন্তুষ্ট নহে, বরং সন্তুটির মূল কারণ হইল "বাদশাহর পক্ষ হইতে পাওয়া"। কারণ, বাদশাহর নিকট হইতে কিছু পাওয়া দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহার প্রতি বাদশাহর সুদৃষ্টি রহিয়াছে। সুতরাং এই ঘোড়াটি যদি সে অন্য কাহারো নিকট হইতে কিংবা জঙ্গলে বিচরণ অবস্থায় লাভ করিত, তবে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। কারণ, তাহার উদ্দেশ্য তো কেবল ঘোড়া পাওয়া নহে, বরং বাদশাহর সুদৃষ্টিই তাহার উদ্দেশ্য। আর এই ক্ষেত্রে সেই মূল উদ্দেশ্যটি হাসিল হইতেছে না।

(৩) তৃতীয় সন্তুষ্টির কারণ হইল, ঘোড়াটিতে সওয়ার হইয়া সফরে বাদশাহর সহযাত্রী হইব এবং বাদশাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমত করিব। আর এই নৈকট্যের সূত্র ধরিয়া বাদশাহর মন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হওয়াও অসম্ভব নহে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সে কেবল এতটুকুতেই সন্তুষ্ট নহে যে, বাদশাহর সুদৃষ্টি লাভ করিয়া আমি তাহার নিকট হইতে ঘোড়া লাভ করিয়াছি। বরং তাহার দৃষ্টি আরো সুদূর প্রসারী। অর্থাৎ শাহী মহলে সে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন পাইতে আগ্রহী, যেন বাদশাহর যাবতীয় দান-অনুদান তাহার মাধ্যমেই প্রদান করা হয়। এই অধিকার বা মন্ত্রীত্ব লাভের ক্ষেত্রেও নিছক মন্ত্রীত্ব লাভই তাহার মূল উদ্দেশ্য নহে। বরং এই প্রক্রিয়ায় বাদশাহর একান্ত সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জনই তাহার আসল উদ্দেশ্য। এমনকি তাহাকে যদি প্রস্তাব করা হয় যে, তুমি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ কর কিন্তু বাদশাহর সাক্ষাত বা তাহার সাহচর্য পাইবে না;

কিংবা বাদশাহর একান্ত সাহাচর্যে থাক কিন্তু মন্ত্রীত্ব পাইবে না– তবে সে শেষোক্ত প্রস্তাবকেই গ্রহণ করিবে।

বর্ণিত তিনটি অবস্থার প্রথমটিতে শোকরের কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। কারণ, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি কেবল ঘোড়ার প্রতি এবং তাহার আনন্দ ও সন্তুষ্টিও ঘোড়া লাভ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ঘোড়াটি কে দান করিল ইহা তাহার নিকট কোন বিবেচ্য বিষয় নহে। অর্থাৎ ইহা সেই লোকদের অবস্থা যাহারা কেবল নেয়মতটি উপকারী হওয়ার কারণেই সন্তুষ্ট হয়। এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থান শোকরের স্তর হইতে বহু দূরে। অর্থাৎ এই শ্রেণীটি শোকরের স্তরে গণ্য বটে, কিন্তু তাহাদের সন্তুষ্টি কেবল নেয়মতদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট, নেয়মতদাতার সত্তার সহিত মোটেও নহে। অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টির মূল কারণ হইল, শাহী নেয়মত লাভ দ্বারা ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, আমাদের প্রতি বাদশাহর সুনজর রহিয়াছে। সুতরাং এই সুনজরের ফলে ভবিষ্যতে আরো নেয়মত পাওয়ার আশা রহিয়াছে। ইহা সেই নেককারদের অবস্থা যাহারা আজাবের ভয় ও ছাওয়াবের আশায় আল্লাহর শোকর ও এবাদত করে।

উপরে বর্ণিত দুইটি স্তরের কোনটিতেই যখন পূর্ণাঙ্গ শোকর পাওয়া গেল না, সুতরাং ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, অতঃপর তৃতীয় স্তরটিতেই পরিপূর্ণ শোকর পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর দেওয়া এই নেয়মত পাইয়া এই কারণে খুশী যে, উহার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও দীদার লাভ করা যাইবে। ইহা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার আসন। ইহার পরিচয় এই যে, মানুষ পারলৌকিক কল্যাণে সহায়ক বিষয় ব্যতীত অপর কিছুতেই সংশ্লিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইবে না এবং যাহা মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে এমন বিষয় দ্বারা দুঃখিত ও বিরক্ত হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ইহা বড় কথা নহে যে, প্রাপ্ত নেয়মতটি মূল্যবান ও সুস্বাদু হইল কি-না। যেমন উপরে বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ের লোকদের নিকট প্রাপ্ত ঘোড়াটি মুখ্য নহে। বরং ঘোড়াটিতে আরোহণ করিয়া বাদশাহর সহযাত্রী হওয়া এবং তাহার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভই হইল সন্তুষ্টির মূল কারণ। এই ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা অনুমান করিতে হইবে।

হযরত শিবলী (রঃ) বলেন, শোকরের উদ্দেশ্য নেয়মত দর্শন নহে, বরং নেয়মতদাতার দর্শন ও দীদার লাভই শোকরের মূল উদ্দেশ্য। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন, সাধারণ মানুষ পানাহার, পোশাক ইত্যাদির কারণেই শোকর করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহওয়ালা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্তরের হালাতের উপর শোকর করেন। ইহার মর্ম সেই সকল লোকদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে যাহারা কেবল উদরপূর্তি, যৌনসুখ, রং-তামাশা ও বিবিধ বিনোদনের

উপরই তৃপ্ত থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্তরের সুখ হইতে বঞ্চিত বটে। কারণ, মানুষের অন্তর যখন সুস্থ থাকে তখন তাহার নিকট আল্লাহর জিকির, দীদার ও মারেফাত ব্যতীত অপর কিছুই ভাল লাগে না। পক্ষান্তরে মানুষের অন্তর যখন অসুস্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার নিকট কেবল মন্দ কর্মসমূহই সুখকর মনে হইতে থাকে। যেমন অনেককে বেশ তৃপ্তির সহিত মাটি খাইতে দেখা যায়। অনেক অসুস্থ ব্যক্তির নিকট মিষ্টদ্রব্য তিক্ত মনে হয়। অর্থাৎ মানুষ অসুস্থ হইয়া পড়ার পর ভাল জিনিসও তাহার নিকট খারাপ মনে হইতে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি উহাই আল্লাহর নেয়মতের প্রকৃত স্বরূপ। যদি কাহারো পক্ষে শোকরের এই শ্রেষ্ঠ স্তর অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে তাহার কর্তব্য অন্ততঃ দ্বিতীয় স্তরের শোকর লাভে সচেষ্ট হওয়া। আর উপরে বর্ণিত তিনটি স্তরের প্রথমটি তো কোন হিসাবের মধ্যেই গণ্য হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে শোকর প্রশ্নে মানগত ব্যবধান অনেক। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের উদ্দেশ্য হইল বাদশাহর নিকট হইতে ঘোড়া পাওয়া। আর তৃতীয় ও শেষোক্ত লোকদের উদ্দেশ্য হইল ঘোড়া পাওয়া। যেন উহার সাহায্যে বাদশাহর খেদমত করা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সাধনা করিতেছে যেন আল্লাহ তাহার উপর নেয়মত নাজিল করেন। অপর ব্যক্তি প্রার্থনা করিতেছে আল্লাহর নেয়মত। তাহার উদ্দেশ্য, ঐ নেয়মতের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর নৈকট্যের স্তরসমূহ হাসিল করা। এই দুই ব্যক্তির মাঝে দুস্তর ব্যবধান।

তৃতীয় বিষয় হইল আমল। অর্থাৎ নেয়মতদাতার মারেফাত তথা তাঁহার পরিচয় লাভের কারণে অন্তরে যেই খুশী অর্জিত হইয়াছে, সেই অনুযায়ী আমল করা। এই আমল অন্তর, জিহবা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সম্পৃক্ত। অন্তরের আমল হইল– অন্তরে কেবল খায়ের ও কল্যাণ পোষন করা। মনে মনে সকলের হিত কামনা করা এবং সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করা। আর জিহবার আমল হইল– মৌখিক শোকর আদায়ের সময় প্রশংসাসূচক এমন শব্দ ব্যবহার করা যাহা দ্বারা শোকর প্রমাণিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ও শোকর হইল– নিজের অঙ্গসমূহকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত করা এবং কোন প্রকার নাফরমানীর কাজে উহাদের সাহায্য গ্রহণ না করা। যেমন চোখের শোকর হইল কোন মুসলমানের অপরাধ দেখিলে তাহা গোপন করা। অনুরূপভাবে কানের শোকর কোন মুসলমানের কোন অপরাধের কথা শুনিলে তাহা অপরের নিকট প্রকাশ না করা। মুখের শোকর হইল, মুখ দ্বারা এমন কথা বলা যাহা দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এইরূপ করিলে আল্লাহর দেওয়া এই সকল নেয়মতের শোকর আদায় হইবে। আর এইরূপ করার হুকুমও রহিয়াছে। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– একদা নবী করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি কেমন আছ? লোকটি আরজ করিল, ভাল। আল্লাহ পাকের প্রশংসার সহিত শোকর করিতেছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমার পক্ষ হইতে এইরূপ জবাবই আশা করিয়াছিলাম। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ পরস্পর যেই কুশল বিনিময় করিতেন, সেই ক্ষেত্রেও তাহাদের উদ্দেশ্য হইত যেন কোন উপায়ে মুখ হইতে আল্লাহর শোকর উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ মুখে শোকর বলাও শোকরগুজারীর মধ্যে গণ্য হইবে।

কথিত আছে যে, একবার কতিপয় ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া হাজির হওয়ার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক যুবক কিছু বলার জন্য দণ্ডায়মান হইল। এই সময় হযরত ওমর (রঃ) যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি সর্বাধিক বয়স্ক, প্রথমে সে কথা বলিবে। অতঃপর তাহার চাইতে কম বয়সের ব্যক্তি কথা বলিবে। অর্থাৎ এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে কথা বলিবে। খলীফার এই প্রস্তাবের জবাবে যুবক আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! যদি সকল কিছুই বয়সের উপর নির্ভরশীল হইত, তবে মুসলমানদের শাসক এমন এক ব্যক্তি হওয়া উচিৎ ছিল যিনি আপনার তুলনায় বয়সে বড়। এইবার খলীফা যুবককে কথা বলার অনুমতি দিয়া বলিলেন, তোমার বক্তব্য পেশ কর। যুবক আরজ করিল, আমরা আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে কিংবা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া এখানে আসি নাই। কারণ, আপনার দানশীলতার সুফল আমরা নিজ ঘরে বসিয়াই প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এখানে আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করার আবশ্যক নাই। আর আপনার আদালতের সম্মুখে ভয় করিবারও কোন কারণ নাই। আমরা কেবল আপনার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে আসিয়াছি। মৌখিক শোকর আদায় করিয়াই আমরা চলিয়া যাইব।

মোটকথা, উপরে আলোচিত তিনটি অবস্থা হইল শোকরের মূল। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, নেয়মতদাতার নেয়মতের কথা বিনয়ের সহিত স্বীকার করার নামই শোকর। শোকরের এই সংজ্ঞায় মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের কতক হালের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশংসা করার নামই শোকর। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কেবল মৌখিক আমলের বিষয়টিকেই বিবেচনায় আনা হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর মতে শোকর হইল– তত্ত্বে নিমগ্ন হওয়া এবং সর্বদা নেয়মতদাতার সম্মান স্মরণে রাখা। এই সংজ্ঞা শোকরের অধিকাংশ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে জিহবার আমল শোকরের বাহিরে থাকিয়া যায়।

শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হযরত জোনায়েদ (রহঃ) বলেন, শোকরকারী

নিজেকে নেয়মতের উপযুক্ত মনে করিবে না। এই সংজ্ঞায় কেবল অন্তরের একটি বিশেষ হালের কথা জানা যায়। বুজুর্গানে দ্বীনের উল্লেখিত উক্তিসমূহ দ্বারা তাহাদের হাল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সকলের হালাত অভিন্ন নহে বিধায় তাহাদের উক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

'আল্লাহর শোকর'-এর তাৎপর্য

কাহারো কাহারো মনে এমন ধারণা হইতে পারে যে, শোকর কেবল এমন ক্ষেত্রেই কল্পনা করা যাইতে পারে, যেখানে কোন নেয়মতদাতা বিদ্যমান থাকে এবং ঐ শোকর দ্বারা তাহার কিছু না কিছু উপকারও হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়– আমরা রাজা-বাদশাহদের যেই শোকর করি তাহা কয়েক প্রকারে হইতে পারে এবং সকল প্রকারেই তাহাদের কিছু না কিছু স্বার্থ অবশ্যই হাসিল হয়। প্রথমতঃ আমরা প্রশংসার মাধ্যমে তাহাদের শোকর করিতে পারি। এই ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহগণ এইভাবে উপকৃত হইবেন যে, মানুষের অন্তরে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকসমাজে তাহাদের দানশীলতার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ সেবা ও খেদমতের মাধ্যমে তাহাদের শোকর করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রেও যে তাহারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হইবেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয়তঃ দাস-দাসীর ছুরতে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শোকর করা। এইভাবেও তাহাদের অনুগত মানুষের আধিক্য দ্বারা তাহাদের প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

মোটকথা, শোকরের কারণে নেয়মতদাতার এই জাতীয় কোন না কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ রক্ষা হয় বটে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে এইরূপ কল্পনা করা দুই কারণে অসম্ভব। প্রথমতঃ তিনি যাবতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হইতে পবিত্র। তাঁহার কোনরূপ সেবা-যত্ন, সাহায্য, সুনাম ও যশ বৃদ্ধি, অনুগত দাস-দাসীর সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় কারণ হইলঃ আমরা নিজেদের ইচ্ছায় যত কাজ করি, উহাও আল্লাহ পাকের আরেক নেয়মত। কারণ, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য, আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা ও বাসনা এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উহার সঞ্চালন ক্ষমতা এই সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং তাঁহার অশেষ নেয়মত। সুতরাং তাঁহার নেয়মতের শোকর তাঁহারই নেয়মত দ্বারা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, বর্ণিত দুই কারণেই আল্লাহর জন্য শোকর করা অসম্ভব। এক্ষণে এমন একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যেন এই জটিলতা নিরসন হইয়া শোকর আদায় করা সম্ভবপর হয়। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হইল, ঠিক এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখী হইয়া হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিয়াছিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমরা কেমন করিয়া

তোমার নেয়মতের শোকর আদায় করিব? কারণ, তোমার নেয়মতের শোকর আদায় করার সুযোগ পাওয়া– ইহাও তো তোমার এক নেয়মত। অতঃপর এই অতিরিক্ত নেয়মতটির শোকর আদায় করাও আমাদের উপর কর্তব্য হইয়া পড়িবে। এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তোমরা যখন এই কথা জানিতে পারিয়াছ, তখন আমি ধরিয়া লইলাম যে, তোমরা আমার শোকর আদায় করিয়াছ।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল– তিনি যখন মর্যাদার একটি স্তর হইতে পরবর্তী স্তরে তরক্কী লাভ করিতেন, তখন মর্যাদার স্তরগত বিবেচনায় পূর্ববর্তী স্তরটিকে পরবর্তী স্তরের তুলনায় "আল্লাহ হইতে অধিক দূরে" কল্পনা করিয়া উহা হইতে এস্তেগফার করিতেন। যেমন এক হাদীসে তিনি প্রতিদিন সত্তর বার এস্তেগফার করার কথা উল্লেখ হইয়াছে। বিশেষভাবে সত্তরের সংখ্যা এই কারণে বলা হইয়াছে যে, প্রতিদিন তিনি মর্যাদার সত্তরটি স্তর অতিক্রম করিতেন এবং মর্যাদাগত বিচেনায় ঐ স্তরসমূহ একটি অপেক্ষা অপরটি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন, আল্লাহ পাক তো আপনার অগ্র-পশ্চাতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, উহার পরও কি কারণে আপনি সেজদায় পতিত হইয়া এত অধিক ক্রন্দন করিতেছেন? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হইব না? উহার অর্থ হইল– আমি কি অধিক মর্যাদার প্রত্যাশি হইব না? কেননা, শোকর করার ফলে আল্লাহর নেয়মত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

–যদি শোকর কর তবে তোমাদিগকে আরো দিব।(সূরা ইব্রাহীম – ৭ আয়াত)

দুনিয়াতে পয়গম্বরগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হইল মানুষকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। এই তাওহীদের পথে মানুষকে বহু বাধা-বিপত্তি ও দূরতিক্রম্য ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। শরীয়তে পরিপূর্ণভাবেই এই সকল বাধ-বিপত্তি অতিক্রম করার পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই পথে বাস্তবতার মুখোমুখি আসিয়া 'শোকর' এবং যে শোকর করে বা যাহার শোকর করা হয়, সকলকেই পৃথক পৃথক মনে হয়। যেমন মনে করঃ কোন বাদশাহ দূরে অবস্থানকারী কোন গোলামের নিকট সওয়ারী, পোশাক, পথের খরচ হিসাবে কিছু নগদ টাকা পাঠাইয়া দিল, যেন সে এই সকল ছামানের সাহায্যে সফর করিয়া শাহী দরবারের নিকটে চলিয়া আসে। এই ক্ষেত্রে বাদশাহর 'নৈকট্য'

লাভের দুইটি ছুরত হইতে পারে। (১) বাদশাহ যদি ইহা চাহেন যে, গোলাম দরবারে আসিয়া কিছু রাজকার্য সম্পাদন করিলে বাদশাহর কিছু সুবিধা হইবে। (২) গোলাম বাদশাহর নিকট চলিয়া আসিলে বাদশাহর কিছুমাত্র উপকার নাই এবং বাদশাহর গোলামেরও কোন প্রয়োজন নাই। আর তাহার আগমনে রাজকার্যেও কোন শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে না। কারণ এই গোলাম দ্বারা এমন কোন কার্য সম্পাদন হওয়া সম্ভব নহে, যাহার ফলে বাদশাহ ঐ কাজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আর রাজদরবারে তাহার আগমন না ঘটিলে সম্রাজ্যেরও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। সুতরাং তাহার জন্য সওয়ারী, পোশাক ও পাথেয় ইত্যাদি আয়োজন করিয়া দেওয়ার পিছনে বাদশাহর উদ্দেশ্য হইল– সে যেন বাদশাহর সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার নৈকট্য লাভে ধন্য হইতে পারে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এককভাবে গোলামই উপকৃত হইতেছে এবং ইহাতে বাদশাহর কিছুমাত্র স্বার্থ নাই।

আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের বিষয়টিকেও উপরোক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের মতই মনে করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে তুলনা করিবার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, কাহারো নিকটই আল্লাহ পাকের কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়টিকে তুলনায় আনা যাইতে পারে। তবে প্রথম ছুরতে গোলাম সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া বাদশাহর নিকট চলিয়া আসিলেই শোকরকারীরূপে গণ্য হইবে না– যতক্ষণ না সে বাদশাহর চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবে। এদিকে দ্বিতীয় ছুরতে যদিও বাদশাহর কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, তথাপি গোলামের পক্ষে শাকের বা কাফের অর্থাৎ শোকরকারী কিংবা অস্বীকারকারী হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। বাদশাহর প্রদত্ত পোশাক ইত্যাদি যদি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার না করিয়া বাদশাহর মর্জি অনুয়ায়ী ব্যবহার করে, তবে সে যেন এই ক্ষেত্রে বাদশাহর শোকর আদায় করিল। পক্ষান্তরে মালিকের প্রদত্ত সামগ্রী সে যদি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখে কিংবা উহা যদি এমন কাজে ব্যবহার করে যাহাতে মালিক সন্তুষ্ট নহেন, অর্থাৎ বাদশাহর দেওয়া পোশাক পরিধান করিয়া ঘোড়াতে আরোহণের পর যদি বাদশাহর দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, তবে সে যেন এই নেয়মত অস্বীকারকারী হইল।

আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাবতীয় কামনা-বাসনার সামগ্রীও মওজুদ করিয়াছেন। মানুষ যখন এই সকল কামনা বাসনা ও শাহওয়াতের সামগ্রী ব্যবহার করে, তখন তাহারা আল্লাহর দরবার হইতে দূরে সরিয়া যায়। অথচ আল্লাহর নিকটে থকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। সুতরাং আল্লাহ পাক এমনসব নেয়মতও সরবরাহ করিয়াছেন যেইগুলির সঠিক

ব্যবহারে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিতে পারে এবং মানুষ ঐগুলি ব্যবহার করিতেও সক্ষম। এই দূরত্ব ও নৈকট্যের বিষয়টি কালামে পাকে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে--

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ * اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ *

অর্থাৎ– আমি সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি নীচ হইতে নীচে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে অশেষ পুরস্কার।(সূরা ত্বীন – ৪-৫ আয়াত)

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের নেয়মতসমূহ এমন মাধ্যম যাহা দ্বারা নিম্নস্তর হইতে উন্নতী লাভ করিয়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সৌভাগ্যের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। আর উহার ফলে মানুষই উপকৃত হইবে। কারণ, মানুষের দূরে অবস্থান কিংবা নৈকট্য লাভ দ্বারা আল্লাহ পাকের কোন ফায়দা হয় না। আর এই ক্ষেত্রে মানুষকে এমনই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে এই ক্ষেত্রে উপকৃতও হইতে পারে, আবার অবহেলা করিয়া নিজের ক্ষতিও করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া নেয়মতকে তাঁহার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করে, তবে সে নেয়মতের শোকরকারী হইল, আর আল্লাহর নেয়মতকে যদি আল্লাহর মর্জির খেলাফ এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তবে সুস্পষ্টভাবেই সে আল্লাহর নেয়মত অস্বীকারকারী হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে সে আল্লাহ পাক স্বীয় নেয়মতকে যেই কাজে ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন সেই কাজে ব্যবহার করে নাই; বরং যেই যেই কাজে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেই কাজেই ব্যবহার করিয়াছে। তা ছাড়া আল্লাহর নেয়মতকে যদি অকেজো করিয়া রাখা হয়, অর্থাৎ আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী কিংবা মর্জির খেলাফ কোন কাজেই ব্যবহার করা না হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নেয়মত অস্বীকারকারী হিসাবেই সাব্যস্ত হইবে। কারণ আল্লাহর দেওয়া নেয়মতকে সে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আল্লাহ পাকের পছন্দ-অপছন্দের পরিচয়

কোন্ বিষয়টি আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় নহে এবং কোন্ বিষয়টি তিনি পছন্দ করেন, এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ব্যতীত আল্লাহর নেয়মতের শোকর করা বা নাশোকরী বর্জন করা প্রশ্নে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, শোকরের অর্থ হইল– আল্লাহর দেওয়া নেয়মতসমূহ আল্লাহর মর্জি মোয়াফেক এবং তাঁহার পছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করা। আর না-শোকরীর

অর্থ হইল– আল্লাহর নেয়মতসমূহকে আদৌ কোন কাজে ব্যবহার না করা কিংবা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করা। এখন আল্লাহ পাক কোন্ বিষয়টি পছন্দ করেন এবং তাঁহার নিকট অপছন্দনীয় বিষয় কোন্‌টি তাহা জানার উপায় দুইটি– (১) এই বিষয়ে কালামে পাকের আয়াত ও হাদীসের বিবরণসমূহ শ্রবণ করা। (২) অন্তরের চোখ দ্বারা অবলোকন করিয়া এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। শেষোক্ত উপায়টি সকলের জন্য সহজসাধ্য নহে বিধায় ইহা বিরল।

আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে দুনিয়াতে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের উছিলায় মানুষের জন্য দ্বীনের পথে চলা সহজ হইয়াছে। মানুষের জীবনাচরণ সম্পর্কে শরীয়তের যাবতীয় আহ্‌কাম ও বিধিবিধান জানিবার পরই এই পথের পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়। সুতরাং যেই ব্যক্তি নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে শরীয়তের বিধিবিধান অবগত না হইবে; তাহার পক্ষে পরিপূর্ণ শোকর আদায় কিংবা শোকরের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় উপায় বা অন্তরের চোখ দ্বারা অবলোকন করার অর্থ হইতেছে– পৃথিবীতে বিদ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে যেই রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে, সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া। কারণ, পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই কোন না কোন রহস্য ও তাৎপর্য লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং ঐ রহস্যের পিছনে আল্লাহ পাকের কোন না কোন উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে। আর যেই বস্তু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ পাকের যেই উদ্দেশ্য নিহিত, দুনিয়াতে সেই বস্তু দ্বারা সেই উদ্দেশ্যের প্রতিফলনই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

এক্ষণে জানা আবশ্যক যে, রহস্য দুই প্রকার। গোপন ও প্রকাশ্য। যাহা প্রকাশ্য ও সকলের নিকট বোধগম্য, সেই সকল রহস্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গোপন ও দুর্বোধ্য রহস্যসমূহ বর্ণনা করা হয় নাই। যেমনঃ সূর্য সৃষ্টির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইল উহার বিবর্তনের ফলে দিবা ও রাত্রি অস্তিত্ব লাভ করা। দিবাভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জীবিকা অর্জন করা এবং রাতের উদ্দেশ্য হইল বিশ্রামের মাধ্যমে দিবসের কর্মক্লান্তি দূর করা। অর্থাৎ ইহা হইল সূর্য সৃষ্টির বাহ্যিক উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সূর্য সৃষ্টির পিছনে আরো বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও গোপন রহস্য রহিয়াছে, যাহা উল্লেখ করা হয় নাই। অনুরূপভাবে মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের পিছনেও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যেমন উহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইল– জমিনের উর্বর-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উহাকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা যেন ঐ শস্য মানুষ ও জীব-জানোয়ারের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করিতে পারে। অর্থাৎ বৃষ্টি-বাদলের এই প্রকাশ্য উদ্দেশ্য যাহা মানুষের নিকট বোধগম্য তাহা পবিত্র কোরআনেও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে যাহা মানুষের বোধগম্য নহে তাহা বর্ণনা করা হয়

নাই। যেমন বৃষ্টি-বাদলের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا وَ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلًا وَّ حَدَآئِقَ غُلْبًا وَ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا * مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ *

অর্থাৎ– মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করিয়াছি। অতঃপর উহাতে উৎপন্ন করিয়াছি শস্য, আঙ্গুর, শাকসজি। যয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস। তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (সূরা আবাছা – ২৪-৩২ আয়াত)

আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ ও তারকাসমূহের রহস্য গোপন রাখা হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে কিছুমাত্র ওয়াকেফ নহে। এই বিষয়ে তাহারা কেবল এতটুকুই জানে যে, তারকাসমূহ দ্বারা আকাশের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করা হইয়াছে, যাহা দেখিয়া মানুষের চক্ষু জুড়ায়। এই প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়া হইয়াছে–

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ *

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি। (সূরা আছছাফফাত – ৬ আয়াত)

মোটকথা, আসমান-জমিনের বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রত্যেকটি অংশের মধ্যেই অগণিত রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। এমনকি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে আল্লাহর সৃষ্টি একটি ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে দশ হাজার রহস্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণীদের কিছু কিছু অঙ্গের রহস্য সকলেরই জানা। যেমন, ইহা সকলেই জানে যে, চক্ষু দেখার জন্য– ধরার জন্য নহে। হাত দেওয়া হইয়াছে ধরার জন্য– চলার জন্য নহে। অনুরূপভাবে পা দেওয়া হইয়াছে চলার জন্য– ঘ্রাণ লওয়া উহার কাজ নহে। এইভাবে অপরাপর অঙ্গসমূহের কার্যাদিও কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গসমূহ যেমন অন্ত্র, পিত্ত, যকৃৎ, মূত্রাশয় এবং শিরা-উপশিরা ইত্যাদির রহস্য সকলের জানা নাই। অনুরূপভাবে আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের কোনটি হয়ত পাতলা আবার কোনটি পুরু, কোনটির গতি একদিকে আবার কোনটির গতি অন্য দিকে, কোনটিকে হয়ত ঝিল্লি সাদৃশ্য করিয়া বিশেষ কোন স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই সকল সূক্ষ্ম অঙ্গসমূহের নিগূঢ় রহস্য মানুষের অজ্ঞাত। আর যাহারা এই সকল বিষয়ে ধারণা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সেই ধারণার পরিধিও নিতান্ত নগণ্য।

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন বস্তুকে এমন কাজে ব্যবহার না করে যেই কাজের জন্য বা যেই উদ্দেশ্যে ঐ বস্তুকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এই ক্ষেত্রে আল্লাহর নেয়মতের নাশোকরী করিল। যেমন কোন ব্যক্তি যদি নিজের হাত দ্বারা অপর কাহাকেও প্রহার করে, তবে সে আল্লাহর দেওয়া হাতরূপ এই নেয়মতের নাশোকরী করিল। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষকে এই উদ্দেশ্যে হাত দিয়াছেন যেন উহা দ্বারা ক্ষতিকর বস্তুকে দমন করিয়া উপকারী ও কল্যাণকর বস্তু গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাক অপরের অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধনের জন্য এই হাত সৃষ্টি করেন নাই। অনুরূপভাবে চোখ দ্বারা যদি কেহ কোন অবৈধ বস্তুর দিকে নজর করে, তবে সে চোখ ও সূর্য এই দুইটি নেয়মতের নাশোকরী করিল। এই ক্ষেত্রে চোখের সহিত সূর্যের সংশ্লিষ্টতার কারণ হইল, চোখের পর্দায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার পরই চোখ দেখিতে পায়। এই দুইটি বস্তু এমন বিষয় অবলোকন করার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা দ্বারা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং যাহা দেখা নিষেধ ও ক্ষতিকর, তাহা দেখা এই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

সারকথা হইল, দুনিয়া এবং উহার যাবতীয় আসবাব এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন উহার সাহায্যে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে কিন্তু যাবতীয় পাপাচার বর্জন পূর্বক আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নহে। জিকির ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না এবং আল্লাহর মোহাব্বত এমন মারেফাত ব্যতীত হাসিল হয় না যাহা ফিকিরের মাধ্যমে অর্জন করিতে হয়। অনুরূপভাবে স্থায়ী জিকির ও ফিকির ব্যতীত দেহ মজবুত হয় না এবং খাদ্য ব্যতীত দেহ স্থিতি লাভ করিতে পারে না। বায়ু, পানি ও মাটি ছাড়া খাদ্য উৎপন্ন হয় না।

মোটকথা, আরো গভীরে তলাইলে বলিতে হয়– আসমান ও জমিন ব্যতীত গোটা সৃষ্টিকুল এবং উহার জাহেরী ও বাতেনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না। আর সৃষ্টির এই সকল আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু হইল দেহ এবং এই দেহ হইল নফসের বাহন। যেই ব্যক্তি এবাদত ও মারেফাতের মাধ্যমে এতমিনান ও স্থিতি লাভ করিয়াছে; এই নফস তাহাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ *

অর্থাৎ– আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা যারিয়াত – ৫৫ আয়াত)

সারকথা হইল, যেই ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ এবং তাঁহার নেয়মতকে আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিবে, সে যেন আল্লাহর নেয়মতের নাশোকরী করিল।

এক্ষণে আমরা গোপন রহস্যসমূহের একটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি যেন উহার আলোকে মানুষ অপরাপর ক্ষেত্রেও শোকর ও নাশোকরীর ব্যবধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়মত সমূহের একটি হইল স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা। এই দুইটি বস্তুর উপরই মানুষের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও কায়কারবার নির্ভরশীল। এই দুইটি বস্তু যদিও জড় পাথর মাত্র– যাহা মানুষের পানাহার কিংবা পরিধানের জাকে আসে না, কিন্তু তবুও এইগুলির উপর মানুষ চরম মাত্রায় মুখাপেক্ষী। কারণ, প্রতিটি মানুষেরই মৌল-মানবিক প্রয়োজন তথা জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বহুবিধ আবশ্যকীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, উপস্থিত ক্ষেত্রে যেই বস্তুটি হয়ত খুবই প্রয়োজন তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট নাই; কিংবা যেই বস্তুটি হয়ত তাহার কোন কাজে আসিতেছে না, সেই বস্তুটি হয়ত তাহার নিকট পড়িয়া আছে। যেমন– কোন ব্যক্তির নিকট হয়ত বেশ কিছু জাফরান আছে। কিন্তু এই জাফরান বর্তমানে তাহার কোন কাজে লাগিতেছে না এবং এই মুহূর্তে সওয়ারীর জন্য একটি উট তাহার খুবই প্রয়োজন। এদিকে অপর এক ব্যক্তির নিকট একটি উট আছে কিন্তু হালে উহা তাহার কোন কাজে লাগিতেছে না। অবশ্য বিশেষ কোন কারণে এই মুহূর্তে তাহার কিছু জাফরান আবশ্যক।

এক্ষণে উট ও জাফরানের মধ্যে অদল-বদল করিতে হইলে প্রথমে উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন প্রকার মূল্য নির্ধারণ না করিয়া উট ও জাফরানের মধ্যে অদল-বদল করা চলিবে না। কারণ, এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান হওয়া আবশ্যক। এইরূপ মূল্য নির্ধারণ না করিয়া যদি কেহ অসঙ্গতভাবে কোন বিনিময় করে তবে তাহা ঠিক হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কাপড়ের বিনিময়ে ঘর কিংবা ঘোড়ার বিনিময়ে আটা বা মোজার বিনিময়ে গোলাম খরিদ করে তবে তাহা ঠিক হইবে না। কারণ, এখানে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান নহে। এখন প্রশ্ন হইল এই সমস্যা নিরসনের উপায় কি? পৃথিবীর কোন বস্তুই তো মূল্যমানে একটি অপরটির হুবহু সমান হওয়া সম্বব নহে। অথচ বস্তুর বিনিময় না হইলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়িতে বাধ্য। মনে কর কৃষকের নিকট আছে খাদ্য এবং চিকিৎসকের নিকট আছে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ। এক্ষণে এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে যদি খাদ্য ও ঔষধের বিনিময় না হয়, তবে কৃষক মরিবে ঔষধের অভাবে এবং চিকিৎসকের প্রাণনাশ ঘটিবে খাদ্যের অভাবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে এমন একটি

মাধ্যম নিরূপন হওয়া আবশ্যক যাহার মাধ্যমে সকল বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করিয়া সুচারুরূপে বিনিময় কার্য সমাধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন এই মুদ্রা দ্বারা যেকোন বস্তুরই মূল্য নির্ধারণ সহজ হইয়া গিয়াছে। একটি উটের মূল্য যদি একশত টাকা হয় তবে একশত টাকার সমমূল্যের জাফরানের সহিত উহার বিনিময় হইতে আর কোন বাধা নাই। এই মুদ্রা দ্বারা বস্তুর সমকক্ষতা নিরূপন সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, এইগুলি না খাওয়া হয়, না পান করা হয়। আর এইগুলির সহিত মানুষের অপর কোন উদ্দেশ্যও সম্পৃক্ত নহে। বস্তুর বিনিময়ের ক্ষেত্রে উহার মূল্যমান নির্ধারণই এই মুদ্রা সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ পাক এই কারণেই মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহা এক হাত হইতে অপর হাতে আবর্তিত হইতে থাকিবে। এই মুদ্রার অপর রহস্য হইল উহা দ্বারা সকল কিছুই লাভ করা যায়।

সুতরাং এই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার মালিক হওয়া যেন ব্যাপক অর্থে অপর সকল বস্তুরই মালিক হওয়া। অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুর মালিক হওয়ার মধ্যে এমন ব্যাপকতা নাই। মনে কর, এক ব্যক্তি কাপড়ের মালিক হইল। এখন এই ব্যক্তির যদি খাবারের প্রয়োজন হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, কোন খাবার বিক্রেতা হয়ত তাহাকে কাপড়ের বিনিময়ে খাবার দিবে না। কারণ, ঐ ব্যক্তির হয়ত কাপড়ের প্রয়োজন নাই। বরং এই মুহূর্তে তাহার হয়ত একটি সওয়ারীর প্রয়োজন। অর্থাৎ এই সম্পদ বিনিময়যোগ্য নহে। সুতরাং বিনিময়ের জন্য এমন একটি বস্তু আবশ্যক, বাহ্যতঃ যেই বস্তুর সহিত কাহারো কোন স্বার্থ সম্পৃক্ত নহে, কিন্তু কার্যতঃ উহাই যেন সকলের সর্বপ্রকার হাজত ও স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ কোন বস্তুর যখন বাহ্যিক কোন ছুরত না থাকে, তখন সকল ছুরতই উহাতে সমভাবে নিহিত থাকে। যেমন বাহ্যতঃ আয়নার নিজস্ব কোন রং নাই; কিন্তু সকল রং-ই উহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। অনুরূপভাবে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার সহিতও বাহ্যতঃ মানুষের কোন স্বার্থ সম্পৃক্ত নহে। উহা খাওয়া হয় না, পান করা হয় না এবং পোশাক হিসাবেও ব্যবহার করা যায় না। অথচ এই মুদ্রা দ্বারাই মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিতে পারে।

মোটকথা, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে আরো বহু হেকমত ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এখন যদি কেহ এই মুদ্রাকে এমন কাজে ব্যবহার করে যাহা উহার উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে কিংবা উহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, তবে সে আল্লাহর এই নেয়মতের নাশোকরী করিল। যেমন কেহ যদি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, তবে সে এই মুদ্রা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিল। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ *

অর্থাৎ যাহারা সোনা ও রূপা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় না করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির কথা শোনাইয়া দিন। (সূরা তওবা –৩৪ আয়াত)

অনুরূপভাবে যাহারা সোনা-রূপার পাত্র বানায় তাহারাও নেয়মত অস্বীকারকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদের এই কাজ উহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখা অপেক্ষা নিন্দনীয় হইবে। সোনা ও রূপার পাত্র নির্মাণ নিন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, 'পাত্র' সাধারণতঃ কোন বস্তু বা তরল পদার্থের হেফাজতের কাজে ব্যবহার হয়। কিন্তু এই কাজে সোনা-রূপার পাত্রের পরিবর্তে মাটি, লোহা, পিতল বা এই জাতীয় অন্য কোন ধাতব পাত্রও ব্যবহার হইতে পারে। পক্ষান্তরে সোনা ও রূপা যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে, লোহা বা অন্য কোন ধাতব বস্তু দ্বারা সেই উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেই ব্যক্তি এই হেকমত ও রহস্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে, সে যেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করে–

مَنْ شَرِبَ فِي اٰنِيَةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يَتَجَرْجَرُ فِي بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ *

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে পানি পান করে, সে যেন তাহার উদরে দোজখের আগুন গট্‌গট্ করিয়া ঢালে।

এমনিভাবে সোনা-রূপার মধ্যে সুদের কারবার করিলেও নেয়মত অস্বীকারকারী ও জালেমরূপে গণ্য হইবে। মোটকথা, কোন্ কাজ করিলে নেয়মতের শোকর আদায় করা হয় এবং কোন্ কর্ম দ্বারা নেয়মতের নাশোকরী হয় তাহা ভালভাবে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যেই বস্তুটি সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ পাকের যেই উদ্দেশ্য ও হেকমত নিহিত, উহাকে সেই হেকমত হইতে ফিরাইয়া রাখা বা উহার সেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে না দেওয়া ইহা ঠিক নহে। আসলে হেকমত সম্পর্কে যেই ব্যক্তির ধারণা সুস্পষ্ট, এই বিষয়টা কেবল তাহার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا *

অর্থাৎ– এবং যাহাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাক্বারাহ – ২৬৯ আয়াত)

যেই সকল অন্তর শাহওয়াত-প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার তাড়নায় আচ্ছন্ন এবং যেই সকল অন্তর শয়তানের ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল অন্তর

কখনো হেকমতের মুক্তার ঝিনুক হিসাবে পরিণত হইতে পারে না। আসলে এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। এই কারণেই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, বনী আদমের অন্তরে যদি শয়তান বিচরণ না করিত তবে তাহারা আসমানের অদৃশ্য রহস্যাবলী অবলোকন করিত।

মোটকথা, মানুষের আচরণ-বিচরণ ও যাবতীয় কর্মের মধ্যে কোন্‌টি শোকর আর কোন্‌টি নাশোকরী তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ মানুষের যে কোন কর্ম দ্বারা হয় আল্লাহর শোকর প্রকাশ পাইবে কিংবা উহা দ্বারা আল্লাহর নাশোকরী প্রকাশ পাইবে। এই ক্ষেত্রে এই দুইটি অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় কোন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নাই। এদিকে এই নাশোকরীর আমলসমূহ পাত্রভেদে মাকরূহ বা হারাম সাব্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেই আমলটিকে মাকরূহ বলা হয়, বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেই আমলটিকেই হয়ত হারাম মনে করা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ডান হাতে এস্তেঞ্জা করে, তবে সে উভয় হাতেরই নাশোকরী করিল। কারণ, আল্লাহ পাক মানুষকে দুইটি হাত দান করিয়াছেন। এই দুইটি হাতের মধ্যে আবার একটি অপরটির তুলনায় উত্তম করা হইয়াছে। এদিকে যেই সকল কর্ম এই দুই হাত দ্বারা সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই সকল কর্মকেও কতক অপেক্ষা কতককে উত্তম করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেন উত্তম হাত দ্বারাই উত্তম কর্ম সম্পাদন করা হয়। যেমন কোরআন শরীফ স্পর্শ করা ইহা একটি উত্তম কর্ম। সুতরাং উত্তম হাত বা ডান হাত দ্বারাই কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে নাপাকী পরিষ্কার করিবে বাম হাতে। এক্ষণে কেহ যদি বাম হাতে কোরআন শরীফ স্পর্শ করে এবং ডান হাতে নাপাকী পরিষ্কার করে, তবে সে উত্তম কর্ম ও উত্তম হাতের সঙ্গে যথাযথ আচরণ না করিয়া এই নেয়মতের নাশোকরী করিল। অনুরূপভাবে কেহ যদি কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে বা কেবলার দিকে বসিয়া মলত্যাগ করে, তবে এই ক্ষেত্রেও সে কেবলার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিল এবং কেবলার নাশোকরী করিল। অনুরূপভাবে কেহ যদি প্রথমে বাম পায়ে জুতা পরিধান করে তবে তাহাও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিহিত হেকমত ও রহস্যের খেলাফ এবং নাশোকরী হইবে। কারণ, জুতা পরিধান করা হয় পায়ের আরাম ও হেফাজতের উদ্দেশ্যে। ইহা পায়ের জন্য উত্তম কর্ম বটে। তো সকল উত্তম কর্মই উত্তম পদ্ধতিতে এবং উত্তমভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি এইরূপ করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিহিত হেকমতের অনুকূল আচরণ হইয়া শোকর আদায় হইবে। অন্যথায় ইহা জুলুম এবং পা ও জুতার নাশোকরী হইবে। অবশ্য ফোকাহায়ে কেরাম জুতা পরিধান সংক্রান্ত তরতীবের খেলাফ আচরণকে যদিও মাকরূহ বলিয়াছেন কিন্তু কোন কোন আরেফ ও বুজুর্গ ইহাকেই বড় অপরাধ

মনে করিতেন। যেমন কথিত আছে, জনৈক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ একবার বেশ কিছু গম দান করিতেছিলেন। কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একবার আমি ভুলক্রমে প্রথমে বাম পায়ে জুতা পরিধান করিয়াছিলাম। এই কারণেই আমি দানের মাধ্যমে উহার প্রতিকার করিতে চাহিতেছি।

উপরোক্ত ঘটনায় বুজুর্গ যেই বিষয়টিকে গোনাহ্ মনে করিয়াছেন ফেকাহের কিতাবে কিন্তু উহাকে গোনাহ হিসাবে উল্লেখ করা যাইবে না। কারণ, ফকীহ্গণের দায়িত্ব হইল সাধারণ মানুষের এছলাহ ও সংশোধন করা। সাধারণ মানুষের অবস্থা যেন অনেকটা চতুষ্পদ প্রাণীদের মত। অর্থাৎ তাহারা এত অধিক পরিমাণে গোনাহে লিপ্ত থাকে যে, এমন সাধারণ বিষয় তাহাদের ক্ষেত্রে ধর্তব্যযোগ্য নহে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বাম হাতে শরাবের পাত্র লইয়া পান করে তবে এই ক্ষেত্রে এমন বলা যাইবে না যে, সে দুইটি অপরাধ করিয়াছে। অর্থাৎ একটি হইল শরাব পান এবং অপরটি বাম হাতে পাত্র ধারণ। কারণ, যেই ব্যক্তি শরীয়তে হারাম ঘোষিত শরাব পান করে, তাহার পক্ষে বাম হাতে পাত্র ধারণের বিষয়টি নেহায়েতই গৌন।

মোটকথা, গোনাহ ছোট হউক বড় হউক, সবই গোনাহ্ বটে। কিন্তু যখন কোন বড় গোনাহ্ সংঘটিত হয় তখন ছোট গোনাহগুলি চাপা পড়িয়া যায়। উহার উদাহরণ এইরূপঃ মনে কর কোন গোলাম যদি স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত তাহার তলোয়ারটি ব্যবহার করে, তবে গোলামের এই আস্পর্ধার কারণে মনিব নিশ্চয়ই তাহাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু গোলাম যদি ঐ তলোয়ার দ্বারা মনিবের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলে, তবে এই ক্ষেত্রে মনিবের অনুমতি ব্যতীত তাহার তলোয়ার ব্যবহারের অপরাধটি কিছুমাত্র আমলে আনা হইবে না এবং উহার কারণে পৃথক কোন শাস্তিরও আয়োজন করা হইবে না। অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের ন্যায় মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ঐ ছোট অপরাধটি চাপা পড়িয়া যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে কেবল ঐ হত্যাকাণ্ডেরই শাস্তি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ– যেই সকল মোস্তাহাব আমল ও আদব আম্বিয়া (আঃ) ও আউলিয়াগণ গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করিয়াছেন এবং আমরা যে ফেকাহের কিতাবে সাধারণ মানুষের জন্য ঐগুলিকেই ধর্তব্যযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি না; উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা উহারই কারণ অনুমান করা যাইবে। অন্যথায় মাকরূহ আমলসমূহের সবই তো নেয়মতের নাশোকরী এবং আল্লাহর নৈকট্যের পথের প্রতিবন্ধক বটে। তবে অপরাধের মাত্রায় কোনটি লঘু এবং কোনটি গুরুতর।

মোটকথা, কোন কর্মেই যেন নাশোকরী ও জুলুম প্রকাশ না পায় সেই

বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ, অনেক সময় অতি সাধারণ ও তুচ্ছ কর্মের মধ্য দিয়াও কেমন করিয়া যে অপরাধ ও নাশোকরী ঘটিয়া যায় তাহা টেরও পাওয়া যায় না। মনে কর, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কোন বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে সে হাত ও বৃক্ষের নাশোকরী করিল। হাতের নাশোকরী হওয়ার কারণ– আল্লাহ পাক এই কারণে মানুষকে হাত দান করেন নাই যে, সে অকারণে উহাকে ব্যবহার করিবে। বরং আল্লাহর এবাদত-আনুগত্য এবং এই কাজে সহায়ক বিষয়ে ব্যবহারের জন্যই এই হাত দান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে বৃক্ষের নাশোকরী হইল– আল্লাহর ইচ্ছায় বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর স্বীয় কুদরতে তিনি আলো, বাতাস, পানি ও মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহের শক্তি সৃষ্টি করিয়া এক সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় উহার ক্রমবিকাশ ও প্রবৃদ্ধির আয়োজন করিয়াছেন, যেন উহার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাইবার পর মানুষ উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এক্ষণে এই বৃক্ষের চূড়ান্ত বৃদ্ধির পূর্বেই উহার ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং মানুষকে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে না দেওয়া– বৃক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও হেকমতের খেলাফ এবং উহার সুস্পষ্ট নাশোকরী। অবশ্য সঙ্গত প্রয়োজনে বৃক্ষশাখা কর্তন করাতে কোন দোষ নাই।

নেয়মতের হাকীকত ও শ্রেণীভেদ

আল্লাহ পাকের নেয়মতের পরিমাপ কিংবা উহার সংখ্যা নিরূপন করা মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে। সুতরাং আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাৎ– তোমরা আল্লাহর নেয়মতসমূহ গনণা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। (সূরা ইব্রাহীম – ৩৪ আয়াত)

অবশ্য আল্লাহর নেয়মতের একটা সামগ্রীক পরিচয় লাভ করা সম্ভব বটে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা এমন কিছু মৌলিক আলোচনা করিব যাহা আল্লাহর নেয়মতের পরিচয় লাভের মূলনীতি হিসাবে কাজ করিবে। পরে পৃথকভাবেও প্রতিটি নেয়মতের উপর আলোকপাত করা হইবে।

মানুষের জন্য যাহা কল্যাণকর, যাহা সুখকর এবং যাহা যাহা মানুষের সৌভাগ্যের উপকরণ, সেই সকল বিষয়কেই নেয়মত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারলৌকিক নেয়মতই হইল আসল নেয়মত। অর্থাৎ পারলৌকিক সৌভাগ্য বহির্ভূত অপর কোন কিছুকেই নেয়মত বলা ঠিক নহে। বড় জোর রূপক অর্থে ঐগুলিকে নেয়মত বলা যাইতে পারে। অবশ্য পারলৌকিক সৌভাগ্যের সহায়ক বিষয়কেও নেয়মত বলা যাইবে। কেননা, প্রকৃত নেয়মত প্রাপ্তির পথে উহা

সহায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে। পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সহায়ক এই নেয়মতকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যায়– (১) এমন বিষয় যাহা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই উপকারী। যেমন এলেম ও সৎস্বভাব। (২) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই যাহা অপকারী ও ক্ষতিকর। যেমন মূর্খতা ও অসৎচরিত্র। (৩) যাহা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর। যেমন খাহেশাত ও কামপ্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আনন্দ উপভোগ করা। (৪) যাহা দুনিয়াতে ক্ষতিকর কিন্তু আখেরাতে উপকারী। যেমন খাহেশাতের চাহিদা দমন করিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করা।

উপরে বর্ণিত চারি শ্রেণীর নেয়মতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীটি হইল প্রকৃত নেয়মত। অর্থাৎ এলেম ও নেক চরিত্র এমন এক নেয়মত যাহা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। দ্বিতীয় প্রকারে বর্ণিত যাহা উভয় জগতেই ক্ষতিকর উহা প্রথম প্রকারের সম্পূর্ণ বিপরীত ও নির্ভেজাল মুসীবত। আর যাহা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর, এমন বিষয়সমূহ আল্লাহওয়ালাগণের নিকট খাঁটি বিপদ। অথচ মূর্খ লোকেরা উহাকেই নেয়মত মনে করিয়া থাকে। উহার উদাহরণ এইরূপ– কোন অভুক্ত ব্যক্তি যদি বিষমিশ্রিত মধু পায় এবং বিষ সম্পর্কে যদি সে অজ্ঞ হয়, তবে এই প্রাণনাশক বিষ মিশ্রিত মধুকেই সে নেয়মত মনে করিবে। কিন্তু পরে বিষক্রিয়া শুরু হইয়া অসুস্থ হওয়ার পর সে জানিতে পারিবে যে, আসলে এই বিষমিশ্রিত মধুই ছিল তাহার জন্য বিপদ। অনুরূপভাবে যাহা দুনিয়াতে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কিন্তু পরকালের জন্য উপকারী; বুদ্ধিমানদের নিকট উহাই নেয়মত এবং মূর্খরা এমন বিষয়কেই বিপদ মনে করিয়া থাকে। ইহার উপমা যেন তিক্ত ঔষধের মত। উপস্থিত ক্ষেত্রে উপকারী ঔষধ তিক্ত হইলেও উহার পরিণতিতে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়। অথচ অবুঝ বালককে যখন এই তিক্ত ঔষধ পান করানো হয় তখন সে উহাকে ভয়ানক আপদই মনে করিয়া থাকে। অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করে, এই ঔষধই নেয়মত এবং যেই ব্যক্তি উহার আয়োজন করিয়া দেয় তাহার নিকট সে কৃতজ্ঞ থাকে। এই একই কারণে দেখা যায়– স্নেহময়ী জননী সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম মমতা থাকা সত্ত্বেও নিছক অজ্ঞতার কারণেই সন্তানের দেহ হইতে শিঙ্গা লাগাইয়া দূষিত রক্ত বাহির করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিতার নজর ভবিষ্যতের প্রতি। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, সন্তানের শরীর হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিতে এই মুহূর্তে তাহার কিছু দৈহিক কষ্ট হইলেও উহা বাহির করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সন্তানের শরীরে এই দূষিত রক্ত থাকিয়া গেলে ভবিষ্যতে উহা বড় ধরনের বিপদের কারণ হইতে পারে। কিন্তু অবুঝ সন্তান এই প্রশ্নে নিজের অজ্ঞতার কারণেই জননীর পদক্ষেপকেই নিজের জন্য হিতকর এবং তাহাকেই প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মনে

করে। আর এই ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা তাহার মনপুত না হওয়ায় তাহার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু এই বালকের যদি হিতাহিত জ্ঞান থাকিত, তবে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিত যে, জননী তাহাকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু এই ভালবাসায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের কারণে অনাগত ক্ষতির দিকগুলি তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। কারণ, দেহাভ্যান্তরের দূষিত রক্ত নিঃসারণ না করার কারণে ভবিষ্যতে হয়ত তাহার এমন মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হইতে পারে যাহা ঐ রক্ত নিঃসারণের কষ্ট অপেক্ষা বহুগুণ বেশী কষ্টের কারণ হইবে। এই কারণেই বলা হয়, মূর্খ বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই এই প্রবাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাইবে। মনে কর, প্রতিটি মানুষই স্বীয় নফসের বন্ধু। কিন্তু উহার বন্ধুত্ব হইল সেই মূর্খ মত। মানুষ আপন নফসের সঙ্গে এমন সব আচরণ করে যাহা হয়ত কোন শত্রুও তাহার প্রতিপক্ষের সঙ্গে করে না। অর্থাৎ মানুষ নফসের খাহেশাত পূর্ণ করার ফলে এক ভয়াবহ ও কঠিন বিপদের শিকার হয়।

পার্থিব সম্পদের নেয়মত

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুসমূহের মধ্যেই ভাল ও মন্দ মিশ্রিত রহিয়াছে। খুব কম বস্তুই এমন পাওয়া যাইবে যাহাতে কেবল ভালাই ও মঙ্গল নিহিত। যেমনঃ বিষয়-সম্পদ, সন্তানাদি ও আত্মীয়-স্বজন। এই সবের মাঝে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ রহিয়াছে। আবার এমন কিছু বিষয়ও আছে যাহা দ্বারা মানুষের পক্ষে কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণের আশংকাই বেশী হইয়া থাকে। যেমন– বিপুল বিষয়-সম্পদ। অবশ্য এমন কিছু বিষয়ও রহিয়াছে; উপকার ও অপকারের ক্ষেত্রে যাহার ক্রিয়া সমান।

মোটকথা, ইহজগতের অধিকাংশ বস্তুর মধ্যেই হিত এবং অহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুরই কিছু অংশ ক্ষতিকর এবং কিছু অংশ হিতকর। সুতরাং মানুষের পক্ষে লাভ ও ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়াই কর্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। যেই বিষয়ে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাণ অধিক উহাকে কল্যাণকর সম্পদ বা নেয়মত মনে করিতে হইবে। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে এই লাভ লোকসানের পরিমাণে তারতম্য হইয়া থাকে। মনে কর, অর্থ-বিত্ত একটি প্রধান সম্পদ। ইহাতে লাভ-লোকসান উভয়ই জড়িত আছে। মানুষের এই সম্পদ যখন অভাব-মোচন পরিমাণ হয়, তখন মানুষ উহা দ্বারা ক্ষতি অপেক্ষা অধিক লাভবানই হইয়া থাকে। আবার অনেক সময় অতি স্বল্প পরিমাণ ধনও মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ স্বল্প পরিমাণ ধনই মানুষের অন্তরে ভোগ-বিলাসের লালসা জাগাইয়া দেয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সামান্য সম্পদও মানুষের জন্য অহিতকর। এই ব্যক্তি যদি এই

সামান্য ধনও না পাইত, তবে নিজেকে ভোগ-বিলাস ও লালসার গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিত। এদিকে এমনকিছু মানুষও রহিয়াছে, বিপুল পরিমাণ বিষয়-সম্পদও যাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অর্থাৎ এই সম্পদ তাহারা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে দান করিয়া আল্লাহর কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই বস্তু অবস্থাভেদে কোন ব্যক্তির জন্য হিতকর হয় বলিয়া তাহার পক্ষে নেয়মতস্বরূপ। আবার কোন ব্যক্তির জন্য তাহা হয়ত অনিষ্টকর হয় বিধায় তাহার পক্ষে আপদ স্বরূপ।

পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য যত বস্তু সৃজিত হইয়াছে, সেই সমুদয় হিতকর বস্তু তিন প্রকার। (১) এমন বিষয় যাহা আপন সত্তায় সরাসরি উদ্দিষ্ট ও কাম্য। (২) এমন বিষয় যাহা অপরাপর বস্তু লাভ করার জন্য কাম্য হয়। (৩) এমন বিষয় যাহা আপন সত্ত্বায় কিংবা অপরকে লাভ করার বিবেচনায়– অর্থাৎ এই উভয়বিধ বিবেচনাতেই উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয় হইয়া থাকে। প্রথমটির উদাহরণ যেমন আল্লাহর দীদার লাভের আনন্দ ও সৌভাগ্য। ইহা এমন এক পারলৌকিক সৌভাগ্য যাহা আর কখনো মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। আর এই সৌভাগ্য এই কারণে কামনা করা হয় না যে, উহা অপর কোন সৌভাগ্য লাভের মাধ্যমে হইবে। বরং উহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষের নিকটপ্রিয় ও প্রার্থিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়টি হইল সোনা-রূপা যাহা আপরাপর বস্তু লাভ করার মাধ্যম বিধায় প্রার্থনা করা হয়। অর্থাৎ সরাসরি উহার সঙ্গে মানুষের কোন স্বার্থ জড়িত নহে। এই দুইটি পদার্থ যদি মানুষের প্রয়োজন পূরণ না করিত, তবে জড় পাথর ও উহার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান ছিল না। কিন্তু ইহা যেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমূহের মূল্যমান নির্ধারণের মানদণ্ড এবং ইহাই যেহেতু যেকোন বস্তু লাভ করার মাধ্যম, এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই পৃথিবীর অধিবাসীদের নিকট এই পদার্থটি অতীব প্রিয়। মানুষ এই সোনা-রূপা সঞ্চয় করে এবং মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া কার্পণ্যের সহিত খরচ করে। আর এই দুইটি পদার্থকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করে। এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা যেন এইরূপ–

মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধুকে খুব মোহাব্বত করে। এখন বন্ধুর প্রতি এই অনুরাগ ও ভালবাসার কারণে তাহার সংবাদবাহককেও ভালবাসে। এখন ক্রমে বন্ধুর সংবাদ বাহকের প্রতি এই ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন এক পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইল যে, অবশেষে আসল বন্ধুর কথা বিস্মৃত হইয়া তাহার সংবাদ বাহককেই নিজের পরম বন্ধু মনে করিতে লাগিল। ইহা নিতান্ত জেহালাত ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

তৃতীয়টি হইল এমন যাহা আপন সত্ত্বা এবং অপরাপর বিষয় লাভ করার

মাধ্যম– এই উভয় বিবেচনাতেই উদ্দিষ্ট হয়। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে (আল্লাহর জিকির ও এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হইয়া) আল্লাহর দীদার হাসিল করা যায়। তা ছাড়া সুস্বাস্থ্য পার্থিব ভোগ বিলাসেরও মাধ্যম বটে এবং এই কারণেও উহা কামনা করা হয়। আবার অনেক সময় সরাসরি এই স্বাস্থ্যই মানুষের কাম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য কেবল এই কারণেই কামনা করা হয় না যে, উহা দ্বারা অপরাপর সুবিধা হাসিল করা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি পদব্রজে চলার প্রয়োজন না হইলেও সে নিজের পদযুগলের সুস্থতা কামনা করে। অথচ পায়ের সুস্থতা এই কারণেই কাম্য হয় যে, চলার কাজে উহার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তো সুস্বাস্থ্য মানুষের নিকট এমনিই কাম্য হইয়া থাকে।

নেয়মতের মূল্যমান

উপরে বর্ণিত তিন প্রকার উত্তম বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত নেয়মত হইল প্রথম প্রকার যাহা আপন সত্ত্বা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষের নিকট প্রিয় ও কাম্য হয়। তৃতীয় প্রকারে বর্ণিত বিষয়টিও নেয়মত বটে, কিন্তু গুরুত্বের বিবেচনায় প্রথম প্রকারের তুলনায় নিম্নতর। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে বর্ণিত সোনা-রূপা যাহা অপরাপর বিষয় হাসিল করার মাধ্যম হিসাবেই প্রার্থিত হয়; উহা খনিজপদার্থ হওয়ার কারণে নেয়মত নহে, তবে উহা নেয়মত লাভ করার মাধ্যম বা উপায় হিসাবে উহাকেও নেয়মত বলা যাইবে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় ইহা কেবল এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নেয়মতরূপে গণ্য হইবে, উহার অভাবে যেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ বিদ্যমান এবং এলেম ও এবাদতই যার জীবনের লক্ষ্য তাহার নিকট স্বর্ণ ও পাথরখণ্ড উভয়ই সমান এবং এতদুভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। আর তাহার নিকট এই স্বর্ণ থাকা না থাকা উভয়ই বরাবর। কিন্তু সোনা-রূপার মালিক হওয়ার পর যদি উহা লইয়া ব্যস্ত থাকার কারণে এবাদত-বন্দেগীতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তবে এমন ব্যক্তির পক্ষে এই সোনা-রূপা নেয়মত নহে। বরং তাহার পক্ষে তো উহা ভয়ানক মুসীবতের কারণ বটে।

হিতকর ও অহিতকর বস্তু

যাবতীয় হিতকর বিষয়সমূহ তিন প্রকার–

(১) যাহা বর্তমানে প্রিয় ও হিতকর

(২) যাহা পরিণামে হিতকর ও প্রিয় এবং–

(৩) এমন উত্তম বিষয় যাহা সর্বাবস্থায় হিতকর মনে হয়। অনুরূপভাবে অহিতকর বিষয়সমূহও তিন প্রকার–

(১) ক্ষতিকর

(২) অসুন্দর ও

(৩) কষ্টদায়ক।

হিতকর এবং অহিতকর বিষয়গুলিও আবার দুই প্রকার। একটি হইল مطلق বা ব্যাপক এবং অপরটি مقيد বা গণ্ডিবদ্ধ। ব্যাপকভাবে হিতকর এমন বিষয়কেই বলা হয়, যাহাতে উপরে বর্ণিত ত্রিবিধ গুণের সমাবেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাহা হিতকর, প্রিয় এবং উত্তমও বটে। তো এমন বিষয় এলেম ও হেকমত ছাড়া আর কিছুই নহে। উহার বিপরীত হইল অজ্ঞানতা ও মূর্খতা যাহা নিকৃষ্টতম স্তরের মন্দ বস্তু। উহা ক্ষতিকর, অসুন্দর ও কষ্টদায়কও বটে।

একজন মূর্খ ব্যক্তি মূর্খতার অনিষ্ট তখনই উপলব্ধি করিত পারে, যখন সে ইহা অনুভব করে যে, আমি মূর্খ। সুতরাং সে যখন নিজের সমবয়স্ক ও সমপর্যায়ের অপর কোন ব্যক্তিকে বিদ্যান দেখিতে পায় এবং তাহার মোকাবেলায় নিজেকে একজন মূর্খ হিসাবে আবিষ্কার করে, তখন সহসা নিজের অন্তরে এক নিদারুন মর্মপীড়া অনুভব করে যে, আমি কেন ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া রহিলাম? এই মানসিক পীড়া ও যন্ত্রণার কারণেই তাহার অন্তরে এলেম শিক্ষা করার আগ্রহ ও শওক পয়দা হইবে। কারণ, এই এলেম সর্বাবস্থায় মানুষের নিকট প্রিয় ও কাম্য হয়। কিন্তু অন্তরে এলেম শিক্ষা করার এই আগ্রহ পয়দা হওয়ার পর কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি উপসর্গসমূহ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এক দোটানা অবস্থার শিকার হয়। অর্থাৎ যদি এলেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে মূর্খতার অভিশাপ তাহার অন্তরে প্রতিনিয়ত শুলের মত বিদ্ধ হইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি এলেম হাসিলের পথে অগ্রসর হয়, তবে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস ইত্যাদি বর্জনপূর্বক এই পথের নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। মোটকথা, এলেমের শওক পয়দা হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার হইল مقيد বা গণ্ডিবদ্ধ অবস্থা। অর্থাৎ এই অবস্থার সঙ্গে ভাল-মন্দ উভয়ই জড়িত। কারণ, অনেক সময় উপকারী বস্তুও ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। যেমন– কাহারো অঙ্গুলীতে পঁচনশীল ক্ষত হইয়াছে। এই ক্ষতের পঁচন সংক্রমিত হইয়া ক্রমে সমস্ত হাতই বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় অঙ্গুলীটিকে কাটিয়া দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিকর ও কষ্টকর মনে হইলেও উহার পরিণামে এক বিরাট ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে বলিয়া ইহা হিতকর। আবার অন্য হিসাবে ইহাকে ক্ষতিকরও মনে করা যাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি একটি ছোট্ট নৌকায় অতিরিক্ত মাল বোঝাই করিয়া নদী পাড়ী দেওয়ার সময় নৌকা ডুবিয়া প্রাণনাশের আশংকায় কিছু মাল নদীতে নিক্ষেপ করিয়া জীবন রক্ষা করিল। এক্ষণে মালামালের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহা ক্ষতি বটে। কিন্তু নিজের জীবনরূপ অমূল্য সম্পদের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে লাভ বলিতেই হইবে।

অনেক সময় ক্ষতিকর বিষয়ও হিতকর বলিয়া প্রমাণিত হয়। যেমন অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে এই অজ্ঞতাও মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়। কেননা, একজন নির্বোধ ব্যক্তি সর্বদা চিন্তামুক্ত থাকে। কারণ, কোন কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাহার কিছুমাত্র ধারণা নাই।

প্রকৃত নেয়মত

মূলতঃ আনন্দ, স্বাদ ও তৃপ্তির নামই হইল নেয়মত। এই তৃপ্তি মোটামুটি তিন প্রকার। (১) আকলী। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত। (২) বদনী বা শারীরিক। ইহার সহিত এক শ্রেণীর প্রাণীও সম্পৃক্ত। (৩) বদনী। ইহার সহিত সকল শ্রেণীর প্রাণী জড়িত।

প্রথম শ্রেণীর আনন্দ

প্রথম শ্রেণীর আনন্দ হইল এলেম-হেকমত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আনন্দ। এই আনন্দ ও তৃপ্তি কেবল মানুষের অন্তরই অনুভব করিতে পারে। মানব দেহের অপরাপর অঙ্গ যেমন কর্ণ, চক্ষু, উদর, শরমগাহ্ ইত্যাদি কোন অঙ্গই এলেম ও হেকমতের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ এই আনন্দ কেবল অন্তর ও ক্বলব দ্বারাই অনুভব করা যায়। অবশ্য এলেম ও হেকমতের আনন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা খুবই বিরল। অর্থাৎ ইহা বিরল ও কম হওয়ার কারণ হইল, একমাত্র আলেমগণ ব্যতীত অপর কেহ এলেমের আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। অথচ পৃথিবীতে আলেম ও তত্ত্বজ্ঞানীদের সংখ্যা খুবই কম।

এদিকে এলেম ও হেকমতের তৃপ্তি শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হইল, ইহা সর্বদা স্থায়ী হয় এবং কোন অবস্থাতেই মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। দুনিয়াতেও না এবং আখেরাতেও না। সর্বোপরি এই এলেমের কারণে মানুষ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেমন অতিরিক্ত আহার করিলে মানুষ অলস ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। নারী সম্ভোগের পর দেহে ক্লান্তি আসে। কিন্তু এলেম ও হেকমত লাভের কারণে

মানুষ কখনো অলসতা ও ক্লান্তির শিকার হয় না। সুতরাং যেই ব্যক্তি এমন শ্রেষ্ঠ, মূল্যবান ও স্থায়ী নেয়মত লাভ করার পরও অপর কোন তুচ্ছ ও অস্থায়ী বিষয়ের উপর রাজী হয়, সে নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃত এবং আপন দুর্ভাগ্যের কারণে বঞ্চিত।

এলেমরূপ মহামূল্যবান সম্পদের একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য হইল, এলেমের হেফাজতের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা প্রহরী নিয়োগ করিতে হয় না। কিন্তু পার্থিব বিষয়-সম্পদের অবস্থা উহার বিপরীত। এলেম মানুষের হেফাজত করে, কিন্তু মালের হেফাজত খোদ মানুষকেই করিতে হয়। এলেম বিতরণ করিলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ধন-সম্পদ যেই পরিমাণ খরচ করা হয়, উহা সেই পরিমাণেই হ্রাস পায়। সম্পদ চুরি-ডাকাতি হয়, কিন্তু এলেম কেহই ছিনাইয়া লইতে পারে না। এই কারণেই আলেমগণ সর্বদা এক অনাবিল আত্মসুখ ও নিঃশংক অবস্থায় জীবন যাপন করেন। কিন্তু মালদার ও বিত্তবানগণ সর্বদা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তা ছাড়া এলেম সর্বাবস্থায় মানুষের জন্য উপকারী, হিতকর ও মোহনীয় হয়। কিন্তু পার্থিব সম্পদ মানুষের জন্য উপকারী হইলেও অনেক সময় উহা বিপদেরও কারণ হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, অধিকাংশ মানুষ এলেমরূপ এহেন সম্পদ হাসিল করিতেছে না কেন। উহার কারণ হইল– এই বিষয়ে মানুষের আগ্রহের অভাব। কারণ কোন বিষয়ে মানুষের আগ্রহের অভাব থাকিলে ঐ বিষয়টি সহজে হাসিল হয় না। কিংবা উহার কারণ এই যে, শাহওয়াত ও প্রবৃত্তির আনুগত্যের কারণে মানুষের মন-মানস উত্তম ও ভাল বিষয় আহরণ করিতে বাধাগ্রস্ত হয়। অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যেমন মধু বিস্বাদ মনে হয়, ঠিক তেমনি এই শ্রেণীর লোকদের নিকটও এলেম কোন উত্তম বিষয় বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানস এমনই ক্রটিযুক্ত যে, এলেমের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তাহাদের মধ্যে পয়দা হয় নাই। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু মধু বা ময়দার স্বাদ কি তাহা বলিতে পারে না। অর্থাৎ এই শিশুর নিকট দুধ ব্যতীত অন্য কিছুই সুস্বাদু বলিয়া মনে হয় না। তাহার নিকট একমাত্র দুধই হইল মজাদার খাবার। ইহা ব্যতীত অন্য কোন খাবার তাহার মুখে তুলিয়া দিলে সে মুখ বিকৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু শিশুর নিকট অন্য কোন খাবার সুস্বাদু মনে না হওয়ার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, অপরাপর খাবার বস্তুর কোনটিই মজাদার নহে। কিংবা শিশুর নিকট দুধ প্রিয় ও সুস্বাদু হওয়া দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, এই দুধ সকল খাদ্যবস্তু অপেক্ষা সুস্বাদু ও মজাদার।

মোটকথা, তিন প্রকার মানুষ এলেমের স্বাদ অনুভব কিংবা উহা হাসিল করা হইতে বঞ্চিত থাকে।

প্রথমঃ যাহাদের অর্ন্তজ্ঞান পয়দা হয় নাই। যেমন অবুঝ শিশু।

দ্বিতীয়ঃ প্রবৃত্তির আনুগত্যের কারণে জীবনের (ভোগ-বিলাসের পরিমণ্ডলের) বাহিরে যাহারা মৃত।

তৃতীয়ঃ প্রবৃত্তির আনুগত্যের কারণে যাহাদের অন্তঃকরণ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি ইশারা করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

অর্থাৎ– তাহাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি আরো বাড়াইয়া দিয়াছেন।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

অর্থাৎ– "যাহাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে।"

এই আয়াতে এমন ব্যক্তিদের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে, যাহারা বাতেনীভাবে জীবিত। দুনিয়াতে এমন বহু মানুষ আছে যাহারা শারীরিকভাবে জীবিত বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মা জীবিত নহে। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ পাকের নিকট মৃতই বটে। অথচ অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এই শ্রেণীর লোকদেরকে জীবিত মনে করে। বাতেনীভাবে জীবিত থাকার এই ব্যাখ্যার আলোকেই বলা হয়– শহীদগণ আল্লাহ পাকের নিকট জীবিত। তাহারা পানাহার করে এবং আনন্দিত হয়– যদিও শারীরিকভাবে তাহারা মৃত বটে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আনন্দ

দ্বিতীয় শ্রেণীর আনন্দ এমন যাহা মানুষ এবং কিছু কিছু পশুও উপভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মোহ। মানব জাতির ন্যায় এই শ্রেণীর আনন্দ ও সুখ ব্যাঘ্র-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরাও উপভোগ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত হীন ও নিকৃষ্ট সুখ বটে।

তৃতীয় শ্রেণীর আনন্দ

এই শ্রেণীর আনন্দে মানুষের সহিত সকল শ্রেণীর প্রাণী জড়িত। অর্থাৎ উদর পুরিয়া আহার ও যৌনসুখ। ইহাও নিতান্ত হীন ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের সুখ। কিন্তু এই সুখ-সম্ভোগ এমনই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল সকল পশু-পক্ষী এই সুখ আহরণে লিপ্ত। এমনকি মশা-মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র

কীট-পতঙ্গও এই দুই প্রকার তৃপ্তি ও সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

পারলৌকিক সৌভাগ্য

মানবের প্রকৃত নেয়মত ও চূড়ান্ত সাফল্য পারলৌকিক সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, আখেরাতের মুক্তি ও নাজাতই মানুষের একমাত্র কাম্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। নিম্নবর্ণিত চারিটি বিষয় এই পারলৌকিক সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এক ঃ بقا – অনন্ত-অসীম ও চিরস্থায়ী জীবন, যাহার কোন শেষ নাই।

দুই ঃ سرور – এমন অনাবিল সুখ ও শান্তি যেখানে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবতের লেশমাত্র নাই।

তিন ঃ علم – এমন এলেম ও জ্ঞান যাহাতে অজ্ঞানতা ও মুর্খতার কোন মিশ্রণ নাই এবং যেই এলেম দ্বারা সর্বদর্শন ক্ষমতা হাসিল হয়।

চার ঃ توانگرى – এমন প্রাপ্তি ও অভাবহীনতা যেন উহার পর আর কখনো অভাবী হওয়ার আশংকা না থাকে। এই চারিটি বিষয়ের সমষ্টিই হইল পারলৌকিক সৌভাগ্যের মূল কথা।

আসলে পৃথিবীর কোন নেয়মতই প্রকৃত ও মূখ্য নহে। পার্থিব নেয়মত সমূহের মধ্যে উহাই প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ নেয়মত, যাহার সাহায্যে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এই কারণেই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এরশাদ ফরমাইলেন–

لا عيش الا عيش الاخرة

অর্থাৎ– "পারলৌকিক শান্তিই প্রকৃত শান্তি।"

দরিদ্র্যতার কঠিন নিস্পেষণ অতিক্রমকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, যেন পার্থিব সাময়িক দুঃখ-কষ্ট মনের অনাবিল শান্তিকে ক্ষুণ্ন করিতে না পারে।

অন্য একবার আনন্দের সময় তিনি উপরের বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহা বিদায় হজ্বের দিনের ঘটনা। যেই দিন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত দ্বীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পূর্ণতার উপলব্ধির মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আনন্দিত ছিলেন। এই সময় উপরোক্ত বাক্যটি উচ্চারণের পিছনে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল– আনন্দের অতিশয্যে তাঁহার আল্লাহগত প্রাণ যেন পার্থিব আনন্দের প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়ে। এই সময় জনৈক ছাহাবী সহসা এইরূপ

দোয়া করিলেন। "আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নেয়মতের পূর্ণতা কামনা করিতেছি।" আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে সঙ্গে ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণাঙ্গ নেয়মত কাহাকে বলে, তাহা তোমার জানা আছে কি? জবাবে ছাহাবী নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, পরিপূর্ণ নেয়মত হইল জান্নাতে প্রবেশ করা।

পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের পার্থিব উপকরণ

যেই সকল পার্থিব উপকরণ পারলৌকিক সাফল্যের কারণ হিসাবে বিবেচিত তাহা ষোল প্রকার। এই ষোল প্রকার উপকরণ আবার চারিভাগে বিভক্ত। যেমন– (১) নফসের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। (২) দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। (৩) এমন বিষয়াদি যাহা দেহের বহির্বিভাগে অবস্থান করিয়া দেহের হিতসাধন করে যেমন– ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, আত্মীয়বর্গ ইত্যাদি। (৪) এমন বিষয় যাহা বর্ণিত অপরাপর বিষয়সমূহকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করে।

বর্ণিত চারিটি বিষয়ের প্রত্যেকটি আবার চারি প্রকার। নিম্নে উহার বিবরণ উল্লেখ করা হইল–

(১) নফসের সহিত সংশ্লিষ্ট চারি প্রকার বিষয়

(১) علم مكاشفم (দর্শণ জ্ঞান)। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সত্তা, গুণাগুণ এবং তাঁহার ফেরেশতা ও রাসূল সম্পর্কীয় এলেমকে বলা হয় এলমে মোকাশাফা।

(২) علم معامله (কার্য সম্পর্কীয় জ্ঞান)। যাবতীয় কার্য সম্পর্কে আল্লাহ পাকের বিধান উত্তমরূপে জানিয়া লওয়ার নাম হইল এলমে মোয়ামালা।

(৩) عفت (পবিত্রতা)। হাসাদ-ক্রোধ, হেরস-লালসা এবং শাহওয়াত ও কুপ্রবৃত্তিজনিত চেতনাকে পরাস্ত করিয়া আত্ম পরিশুদ্ধি অর্জন করার নাম ইফ্ফত।

(৪) عدل (ইনসাফ বা সমতা)। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে অন্তর হইতে একেবারে নির্মূল করিয়া দেওয়া যেমন ক্ষতিকর, ঠিক তেমনি উহাদের শক্তি বাড়াইয়া সীমা অতিক্রম করিতে দেওয়াও ক্ষতিকর। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যখন ইচ্ছা নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত দমাইয়া রাখা কিংবা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে লাগামহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া– ইহা সামঞ্জস্যের পরিপন্থী। এই মর্মে কালামে পাকে এরশাদ

হইয়াছে–

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ * وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُ الْمِيْزَانِ *

অর্থাৎ– যাহাতে তোমরা সীমা লংঘন না কর তুলাদণ্ডে তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না। (সূরা রাহমান –৮-৯ আয়াত)

এক্ষণে কেহ যদি নিজের শাহওয়াত বা কামোত্তেজনা দমন করার উদ্দেশ্যে নিজের যৌনশক্তি একেবারে নস্যাত করিয়া দেয় কিংবা বিবাহ করার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেবল ঝামেলা এড়াইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ না করে, কিংবা কেহ যদি খাদ্য ত্যাগ করিয়া অবশেষে এবাদত-বন্দেগী করার শক্তিও হারাইয়া ফেলে, তবে এই ক্ষেত্রে সে "ন্যায্য ওজন কায়েম" না করিয়া সীমালংঘন করিল।

(২) দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট চারি প্রকার বিষয়

দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট চারি প্রকার বিষয় হইল–

(১) সুস্থতা (২) শক্তি (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) দীর্ঘায়ু।

সুস্থতা, শক্তি ও দীর্ঘায়ু এই তিনটি সম্পদ পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনে কতটা সহায়ক হইতে পারে তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই পারলৌকিক সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় চেহারার ভূমিকা বিশেষ কর্যকর নহে। তবে এই ক্ষেত্রে কেবল দুই কারণে সৌন্দর্য দ্বারা লাভবান হওয়া যাইতে পারে–

প্রথম কারণ

সুন্দর ও মোহনীয় চেহারার লোকদের উদ্দেশ্য ও কার্য সহজে উদ্ধার হইয়া থাকে। কারণ যেই ব্যক্তির চেহারা সুন্দর, আশেপাশের সকলে স্বেচ্ছায় তাহার কাজে সহযোগিতা করিতে আগ্রহী হয়। সুতরাং 'সৌন্দর্য' সম্পদের মতই এমন একটি অস্ত্র যাহা দ্বারা সহজে কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দুনিয়ার কার্যক্ষেত্রে যাহা দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, আখেরাতের কার্যক্ষেত্রেও উহা দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে বলা যায়– পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও 'সৌন্দর্য' কিছুটা ভূমিকা রাখিতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ

মানবের চেহারায় তাহার আত্মারই হালাতের বিকাশ ঘটে। যেই ব্যক্তির আত্মা ও নফস ভাল, তাহার চেহারা হইতেও খায়ের ও মঙ্গলের অভিব্যক্তি ঘটিবে। ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, মানুষের আত্মায় যখন নূর বিকশিত হয়,

তখন তাহার বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বেও উহার আছর প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়– মানুষের জাহের ও বাতেন একটি অপরটির অনুগামী ও মোয়াফেক হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ অনেক সময় মানুষের আত্মার অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বের অবস্থাটিকেও বিবেচনায় আনিতেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের চেহারা ও চক্ষু যেন তাহার আত্মার আয়নাবিশেষ। এই আয়নাতেই আত্মার অবস্থা অবলোকন করা যায়। মানুষের আত্মায় যখন 'ক্রোধ' সঞ্চারিত হয়, কিংবা কোন কারণে মানুষের চিত্ত যখন প্রফুল্ল হয়, তখন অবশ্যই তাহার চোখে-মুখে উহার প্রভাব প্রতিবিম্বিত হইবে। এই কারণেই কোন কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন, মন্দ স্বভাবের লোকদের চেহারা কখনো সুন্দর হয় না।

একবার কতিপয় যুবক সৈনিক বিভাগে চাকুরীর আবেদন লইয়া খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারে হাজির হইল। খলীফা দেখিতে পাইলেন, চাকুরীপ্রার্থী যুবকদের মধ্যে একজনের চেহারা খুবই অসুন্দর। পরে তিনি যুবকের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিতে পাইলেন, যুবকটি তোৎলা এবং সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। অবশেষে তিনি চাকুরীপ্রার্থীদের তালিকা হইতে যুবকের নাম কাটিয়া দিয়া বলিলেন, রূহের চমক মানুষের জাহেরী জিসিম বা ব্যাহ্যিক অঙ্গ-অবয়বে প্রতিফলিত হইলে মানুষ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। আর রূহের চমক যদি বাতেন বা দেহের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত হয়, তবে মানুষ বাকপটুতা লাভ করে। কিন্তু এই যুবকের তো জাহের-বাতেন কিছুই নাই।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "সুন্দর চেহারার লোক দেখিয়া নিজের স্বভাব মোচনের জন্য দোয়া কর।" আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কোথাও দূত পাঠাইতে হইলে সুদর্শন ও সুন্দর চেহারার লোককে পাঠাইও। ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, নামাজের ইমামতের প্রশ্নে যদি দুই ব্যক্তি সমান আলেম, সমান ক্বারী এবং সমান পরহেজগার হয়, তবে এই ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি অধিক সুদর্শন তিনিই ইমামতের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

আমাদের আলোচ্য সুন্দর দ্বারা এমন সুন্দর চেহারা উদ্দেশ্য নহে যাহা দেখিলে দর্শকের মনে কামভাব জাগরিত হয়। বরং এমন সুন্দর ও চমৎকার অঙ্গ-সৌষ্ঠব যাহা দেখিবামাত্র দর্শকের মনে শ্রদ্ধা-ভাব জাগরিত হয় এবং কোন প্রকার বিরক্তি উদ্রেক হয় না– এমন সৌন্দর্যকেই পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জনের সহায়ক বলা হইয়াছে।

(৩) এমন বিষয় যাহা দেহের বহির্বিভাগে অবস্থান করিয়া দেহের হিতসাধন করে

যেই সকল বিষয় দেহের বাহিরে অবস্থান করিয়াও দেহের হিতসাধন করে, সেইগুলি চারি প্রকার। (১) ধন-সম্পদ (২) প্রভাব-প্রতিপত্তি (৩) পরিবার-পরিজন (৪) বংশ মর্যাদা। নিম্নে আমরা এই চারিটি বিষয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা করিতেছি।

(১) একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যাহার অর্থ নাই; কোন কাজেই তাহার স্বস্তি নাই। পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান থাকিলে জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া তৃপ্তির সহিত এবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা যায়। নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে দর্শন-তত্ত্ব বিষয়ে এলেম হাসিলের চেষ্টা করার উদাহরণ যেন সেই ব্যক্তির মত, যেই ব্যক্তি অস্ত্র ছাড়া রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে, কিংবা সেই বাজ পাখীর মত যেই বাজ পাখী শিকার করিতে চায়, অথচ সে নিজে উড়িতে অক্ষম।

মোটকথা, বিত্তহীন ও দরিদ্র ব্যক্তি দ্বারা বিশেষ কোন কাজ সম্পাদিত হয় না। কারণ অভাবী ব্যক্তিকে সর্বদা জীবিকার সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে হয় বলিয়া তাহার পক্ষে অপর কোন মহৎ কাজে অবদান রাখার সুযোগ হয় না। বিত্তহীন ব্যক্তি হজ্ব, জাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদির ফজিলত হইতে মাহরূম থাকে।

(২) প্রভাব-প্রতিপত্তিও পারলৌকিক সাফল্যের পথে সহায়ক বলিয়া গণ্য হয়। কারণ, একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষে কোন জনহিতকর কর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন যতটা সহজ হইবে, সামাজিকভাবে গুরুত্বহীন ব্যক্তির পক্ষে উহা আঞ্জাম দেওয়া ততটা সহজ হইবে না।

(৩) পরিবার-পরিজন এই কারণে পারলৌকিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে যে, পার্থিব জীবনে তাহাদের সহযোগিতার ফলে ধর্ম-কর্মে যেই পরিমাণ অংশগ্রহণ করা যায়, তাহাদের সহযোগিতা না হইলে হয়ত সেই পরিমাণ সম্ভব হয় না। সুসন্তান মানুষের জন্য হাত, পা, পাখা ও পালকের মত। অর্থাৎ হাত-পা দ্বারা জীব-জন্তুর এবং পাখা ও পালক দ্বারা যেমন পক্ষীকুলের জীবন যাত্রায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুসন্তান দ্বারা পিতামাতার এমনসব কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে, যাহা হয়ত তাহাদের সহযোগিতা না হইলে অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত, কিংবা সমাধা করিতে বেশ বেগ পাইতে হইত। যেই ব্যক্তি সংসারে একা তাহার পক্ষে সংসারের যাবতীয় কর্ম সমাধা করিয়া

জিকির-তেলাওয়াত ইত্যাদি পারলৌকিক পুণ্যকর্মে মনোযোগী হওয়ার বিশেষ সুযোগ হয় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পরিবারের লোকদের সহযোগিতার ফলে যদি দ্বীনের কাজে অধিক অংশগ্রহণ করা যায় তবে এই সূত্রে ইহারা অবশ্যই পারলৌকিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে বটে।

(৪) বংশ যদি নেক হয় তবে উহাও মানুষের জন্য পারলৌকিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে। শরীফ খান্দানের লোক সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে। এই কারণেই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আদমের শ্রেষ্ঠ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন– "ভাল স্থানে বীজ বপন কর এবং অপবিত্র ভাগাড়ে উৎপন্ন সবুজ বৃক্ষ পরিত্যাগ কর।"

উপস্থিত জনৈক ছাহাবী আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অপবিত্র ভাগাড়ে উৎপন্ন সবুজ বৃক্ষ কি? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, "এমন সুন্দরী নারী যার বংশ ভাল নহে"। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, শরীফ ও নেক খান্দানও আল্লাহর নেয়মত বটে।

শরীফ খান্দানের অর্থ ইহা নহে যে, বিত্তবান-জালেম ও দুনিয়াদার লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হইতেছে। এ স্থলে বরং দ্বীনদার-পরহেজগার এবং আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট খান্দানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই বংশগত বিবেচনার হেকমত ও তাৎপর্য কি? জবাবে আমরা বলিব, মানুষের মন-মানস, আখলাক-চরিত্র এবং শারীরিক শক্তি ও আয়ু ইত্যাদিতে বংশের ধারা ও তাছীর রহিয়াছে। আর এইগুলি কোন উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। কেননা, এলেম-আমল তথা পারলৌকিক সৌভাগ্য শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দ্বারাই হাসিল হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাও দেখা গিয়াছে, পূর্বপুরুষগণ নেককার, পরহেজগার, দীর্ঘায়ু ও সুঠামদেহের অধিকারী হইলে পরবর্তী বংশধরের মধ্যেও উহার ধারা অব্যাহত থাকে। বৃক্ষের মূল যদি ভাল হয় তবে উহার শাখা-প্রশাখাও সতেজ ও মজবুত হইবে।

(৪) এমন বিষয় যাহা উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে

যেই চারিটি বিষয় উপরে আলোচিত বারটি বিষয়কে পরিচালনা করে তাহা এই (১) هدايت (হেদায়েত) সৎপথ প্রাপ্তি। (২) رشد (রুশ্দ) সদিচ্ছা (৩) تشديد (তাশদীদ) সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা। (৪) تائيد (তাঈদ) সাহায্য। এই চারিটি বিষয়ের সমষ্টিকে বলা হয় توفيق (তাওফীক)। তাওফীক অর্থ

আল্লাহ পাকের বিধান এবং বান্দার ইচ্ছার সমন্বয়। সৎ বা অসৎ উভয় প্রকার কার্যেই বান্দার ইচ্ছা ও চেষ্টা এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানের মধ্যে ঐক্য হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ সৎ কাজের মধ্যে উহাদের সমন্বয় সাধনকেই তাওফীক বলা হয়। আল্লাহ পাক তাওফীক না দিলে মানুষ কিছুই করিতে পারে না এবং কোন কিছুই মানুষের পারলৌকিক সাফল্যের পথে সহায়তা করিতে পারে না।

হেদায়েত ঃ মুক্তিকামী সকল মানুষের জন্যই হেদায়েত এক অপরিহার্য বিষয়। সুতরাং সকল মানুষই হেদায়েতের মোহতাজ। কোন মানুষ যদি পারলৌকিক সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হয়, তবে তাহার কর্তব্য প্রথমেই এই সৌভাগ্য লাভের পথ চিনিয়া লওয়া। সুতরাং পথের সন্ধান না লইয়া কেবল 'ইচ্ছা' করিয়া মেহনত করিলেই কোন কাজ হইবে না। অতএব, বান্দার ইচ্ছা, আল্লাহর বিধান এবং পথের সম্বলের সহিত হেদায়েতের সংযোগ না ঘটিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইবে। সুতরাং কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

অর্থাৎ– আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করিয়াছেন।(সূরা ত্বোহা- ৫০ আয়াত)

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ– "আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

হাদীসে বর্ণিত 'রহমত'-এর অর্থ হইল হেদায়েত। এই হাদীস শুনিয়া উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, আমিও আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব না।

বর্ণিত হেদায়েত প্রাপ্তির তিনটি পথ রহিয়াছে। নিম্নে আমরা ধারাবাহিকভাবে উহার আলোচনা করিব।

প্রথম শ্রেণীর হেদায়েত প্রাপ্তি

বুদ্ধিমান লোকদিগকে আল্লাহ পাক ভাল-মন্দ তমিজ করার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধি বলে কিংবা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এই ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কালামে পাকে

এরশাদ হইয়াছে–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ *

অর্থাৎ– বস্তুতঃ আমি তাহাকে দুইটি পথ প্রদর্শন করিয়াছি। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে– (সূরা বালাদ – ১০ আয়াত)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى

অর্থাৎ– আর যাহারা সামুদ সম্প্রদায়, আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করিল।

বর্ণিত আয়াতে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হেদায়েতের কথা বলা হইয়াছে। মোটকথা, আল্লাহর দেওয়া বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কিংবা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এই উভয়বিধ উপায়ে সরল পথের সন্ধান লাভের উপায় রহিয়াছে। কিন্তু উহার পরও যেই ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই হাছাদ-ঈর্ষা কিংবা পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার কারণেই হেদায়েতের বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হেদায়েত প্রাপ্তি

বিশেষ এক শ্রেণীর লোক বিপুল পরিশ্রম ও মোজাহাদা দ্বারা এই হেদায়েত লাভ করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক হেদায়েতপ্রাপ্ত এই শ্রেণীটিকে সর্বদা সাহায্য করেন। এই মর্মে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

অর্থাৎ– "মানুষ যখন আমার পথ চিনিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন আমি তাহাদিগকে আমার পথ চিনাইয়া থাকি।" অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে– (সূরা আন্‌কাবুত – ৬৯ আয়াত)

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

অর্থ– যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সৎপথ-প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি পায়। (সূরা মুহাম্মদ – ১৭ আয়াত)

মোটকথা, এস্থলে সেই হেদায়েতের কথা বলা হইয়াছে, যাহা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিপুল সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীর হেদায়েত প্রাপ্তি

হেদায়েতের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরবর্তী এই হেদায়েত এমন এক নূর যাহা

হেদায়েতের পূর্ণতার পর আলমে নবূয়্যত ও বেলায়েতের মধ্যে বিকশিত হয়। এই হেদায়েত নিতান্ত অসাধারণ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও যাহারা অধিকতর বিশিষ্ট, কেবল তাহারাই এই হেদায়েত লাভ করিয়া থাকেন। এই হেদায়েতের নাম "হেদায়েতে মোতলাক"। অন্যান্য হেদায়েতসমূহ হইল এই হেদায়েতের ভূমিকা স্বরূপ। এই হেদায়েত আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহে নাজিল হয় এবং ইহা সাধনা ও পরিশ্রম করিয়া হাসিল করা যায় না। মানুষের আকল ও বুদ্ধি দ্বারা ইহার পরিচয় লাভ করাও সম্ভব নহে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى

(সূরা বাক্বারাহ – ১২০ আয়াত)

অর্থাৎ– "আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত।"

এই শ্রেণীর হেদায়েতকেই আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতে হায়াত বা জীবন আখ্যা দিয়া ফরমাইয়াছেন–

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا *

অর্থাৎ– আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং তাহাকে এমন একটি আলো দিয়াছি, যাহা লইয়া সে মানুষের মাঝে চলাফিরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পারে, যে অন্ধকারে রহিয়াছে– তথা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না? (সূরা আল-আন্‌আম - ১২২ আয়াত)

রুশদ বা সদিচ্ছা

রুশদ বলা হয় আল্লাহ পাকের এমন অনুগ্রহকে যাহা মানুষকে আপন লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হইতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মানুষের স্থিরকৃত লক্ষ্যটি যদি তাহার পক্ষে কল্যাণকর হয় তবে তাহাকে আরো উৎসাহিত করা হয়। পক্ষান্তরে লক্ষ্যটি তাহার জন্য ক্ষতিকর হইলে উহাতে তাহাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ *

অর্থাৎ– আর আমি ইতিপূর্বেই ইবরাহীমকে তাহার সৎপন্থা দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। (সূরা আম্বীয়া – ৫১ আয়াত)

মোটকথা, হেদায়েত লাভের পর সেই অনুযায়ী পথ চলার সদিচ্ছাকেই রুশদ বলা হয়। মনে কর, কোন বালক যৌবনে পদার্পন করিয়া সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ এবং ব্যবসার রীতি-নীতি শিক্ষা করিল, কিন্তু এই সকল বিষয় শিক্ষা

লাভের পরও সে সম্পদের অপচয় করিল এবং উহা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির কোন ইচ্ছা করিল না। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে رشيد 'রাশীদ' বা 'সদিচ্ছাযুক্ত' বলা যাইবে না। অর্থাৎ সম্পদ সঞ্চয়-সংরক্ষণ এবং উহা বৃদ্ধির উপায় ও পন্থা শিক্ষা করিয়া হেদায়েত লাভের পরও সেই অনুযায়ী তৎপর হওয়ার ইচ্ছা অন্তরে উদয় না হওয়ার কারণে তাহার মনে 'রুশদ' পয়দা হয় নাই।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া-শুনিয়া কোন ক্ষতিকর কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও বলা হইবে যে, ভাল-মন্দ বিষয়ে লোকটির হেদায়েত হাসিল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে 'রুশদ' উৎপন্ন হয় নাই। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আমলের পন্থা বিষয়ে হেদায়েত প্রাপ্তির তুলনায় 'রুশদ' হাসিল হওয়াতেই অধিক সাফল্য এবং ইহা আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়মত বটে।

তাশদীদ বা সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা

তাশদীদ অর্থ হইল– বান্দার যাবতীয় কার্যকলাপ অতি আছান ও সহজ গতিতে সঞ্চালন করা, যেন শীঘ্র অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিছক হেদায়েত দ্বারা যেমন অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না, বরং সদিচ্ছা উৎপাদনকারী 'রুশদ' এর প্রয়োজন হয়, অনুরূপভাবে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে শুধু রুশদ দ্বারাও কোন কাজ হয় না। বরং এই ক্ষেত্রেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহজ সঞ্চালন আবশ্যক হয়।

মোটকথা, 'হেদায়েত' হইল পথের সন্ধান এবং কার্যের প্রতি সদিচ্ছা উৎপাদন হইল 'রুশদ'। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে নেক ও মঙ্গলময় কার্যের প্রতি সঞ্চালন করা হইল তাশদীদ।

তাঈদ বা সাহায্য

এই তাঈদ উপরে বর্ণিত সকল কিছুর মূল। অর্থাৎ তাঈদ হইল আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অন্তরে অনুভূত এমন সাহায্য যাহার ফলে মানব মনে কর্মের স্পৃহা গতিশীল হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। আল্লাহ পাকের তাঈদ ও সাহায্য না আসা পর্যন্ত মানুষের ইচ্ছা কেবল ইচ্ছাই থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ হৃদয়-মাঝে কার্যের স্পৃহা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কার্যের গতি সঞ্চারিত হইবে না।

বর্ণিত তাঈদের পাশাপাশি 'ইছমত' এর অবস্থান। ইছমত অর্থ হইল পাপকর্ম হইতে নিবৃত্তকরণ। মানব-হৃদয়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে 'তাঈদ' আসিয়া সৎকর্মের প্রতি প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে পাপ হইতে

নিবৃত্ত থাকা এবং পাপের প্রতি ঘৃণার যেই মনোভাব পয়দা হয় উহাই ইছমত। কিন্তু নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী এই তাঈদ এবং পাপ হইতে নিবৃত্তকারী ইছমত কেমন করিয়া হৃদয়ে পয়দা হয় তাহা মানুষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا، لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ *

(সূরা ইউছুফ — ২৪ আয়াত)

অর্থাৎ– "নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোকটি তাহার প্রতি (ইউসুফের প্রতি) খারাপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, যদি তিনি স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন না করিতেন, তবে তিনিও তাহার প্রতি মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন।"

অর্থাৎ– ঘটনাক্ষেত্রে যদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে পাপকর্ম হইতে নিবৃত্তকারী সাহায্য বা 'ইছমত' না আসিত, তবে হয়ত হযরত ইউসুফ (আঃ)ও উহাতে জড়াইয়া পড়িতেন। অর্থাৎ এই নিবৃত্তকারী সাহায্যের নামই ইছমত।

উপরে ষোল প্রকারের নেয়মতের একটা সঠিক বিবরণ উপস্থাপন করা হইল। এই নেয়মত সমূহের প্রত্যেকটি এমন যাহা নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে এবং অপরের সাহায্য ছাড়া একাকী পারলৌকিক সাফল্য অর্জনে সাহায্য করিতে পারে না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সহযোগী উপাদান আবশ্যক হয়। আবার এই উপাদানগুলিও অপর কতক উপকরণের মুখাপেক্ষী থাকে। অর্থাৎ এইভাবেই এই সাহায্য প্রক্রিয়ার ছেলছেলা অনন্ত ধারায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং সবশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া এই ছেলছেলার সমাপ্তি হয়।

শোকর আদায়ে অবহেলা

মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণেই মানুষ আল্লাহর নেয়মতের শোকর আদায় করে না। মূর্খতার কারণে যেই ব্যক্তি নেয়মতের পরিচয় পায় নাই, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া নেয়মতের শোকর আদায় করিবে? এদিকে যাহারা নেয়মতের পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কতক লোকের ধারণা, কেবল মুখে "আল্ হাম্দুলিল্লাহ" কিংবা "আল্লাহর শোকর" বলিয়া দিলেই নেয়মতের শোকর আদায় হইয়া যাইবে। কারণ, তাহাদের এই কথা জানা নাই যে, আল্লাহ পাক যেই নেয়মত যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে যথাযথভাবে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাকেই নেয়মতের শোকর বলা হয়। আর নেয়মত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহর আনুগত্য। এই দুইটি বিষয় অবগত হওয়ার পরও যদি কেহ শোকর না করে তবে মনে করিতে হইবে, তাহার পক্ষে শোকর আদায়ে

বাঁধা হইল– শাহ্ওয়াত ও কামনা-বাসনার প্রাবল্য এবং শয়তানের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। নেয়মতের পরিচয় লাভ করা হইতে গাফেল থাকার কারণ অনেক। প্রথমতঃ যেই সকল নেয়মত ব্যাপক ও সহজলভ্য; মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণেই ঐগুলিকে নেয়মত মনে করা হয় না। ফলে উহার শোকরও আদায় করা হয় না। যেমন আল্লাহ পাক আহার ও পানীয় সম্পর্কিত যেই সকল নেয়মত দান করিয়াছেন উহা এমনই ব্যাপক-বিস্তৃত ও সর্বত্র বিদ্যমান যে, এই সহজলভ্যতার কারণে উহাকে নেয়মত বলিয়া স্বীকারই করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশুদ্ধ বায়ুর কথাই মনে কর– যাহা আমরা নিশ্বাস গ্রহণের সময় ভিতরে টানিয়া লইতেছি, ইহাকে কেহই নেয়মত বলিয়া গণ্য করে না। অথচ এক মুহূর্তের জন্যও যদি কাহারো গলা চাপিয়া ধরা হয়, তবে সহসাই ইহা উপলব্ধি হইবে যে, এই পৃথিবী এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছুর তুলনায় আল্লাহর দেওয়া এই সামান্য বায়ু কত মূল্যবান।

কাহাকেও যদি কোন উত্তপ্ত হাম্মাম কিংবা এমন পুতিগন্ধময় কুপের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয় যাহার বায়ু হিমশীতল, তবে তথাকার উত্তপ্ত ও বদ্ধ বায়ুতে যখন হাঁপাইয়া উঠিয়া প্রাণ বাহির হইয়া আসার উপক্রম হইবে; এমতাবস্থায় তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া উন্মুক্ত পরিবেশে আনিবার পর সে যখন বুক ভরিয়া বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ু গ্রহণ করিবে, তখন আর কেহ এই কথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই বিশুদ্ধ বায়ু কত বড় নেয়মত। অর্থাৎ নেয়মত যখন সর্বদা হাতের কাছে বিদ্যমান ও সহজলভ্য থাকে, তখন উহার কদর ও গুরুত্ব বুঝে আসে না। কিন্তু কোন কারণে যদি কখনো উহা ছিনাইয়া লওয়া হয়, তবে সেই সময় ভালভাবেই উহার গুরুত্ব বুঝে আসে। কিন্তু নেয়মতের গুরুত্ব উপলব্ধি যদি উহা ছিনাইয়া লওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে মানুষের জন্য ইহা দুর্ভাগ্যজনকই বলিতে হইবে। মানুষের উচিৎ ছিল সর্বদা আল্লাহর নেয়মতের শোকর আদায় করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা উহার বিপরীত অবস্থাই দেখিতে পাই।

একজন সুস্থ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির 'দৃষ্টিশক্তি' বিনষ্ট কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে তাহাকে এই দৃষ্টিশক্তির শোকর করিতে দেখা যায় না। অবশ্য আল্লাহর দেওয়া এই চক্ষু যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তখন ভালভাবেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। অতঃপর আল্লাহ যদি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন তখন উহাকে নেয়মত মনে করিয়া উহার শোকর আদায় করা হয়।

অনুরূপভাবে যেই বেয়াড়া গোলামকে সর্বদা চাবুক দ্বারা প্রহার করিয়া সোজা রাখা হয়, কোন কারণে যদি কিছু সময়ের জন্য তাহার সেই প্রহার বন্ধ রাখা হয়, তবে সে ইহাকে বিরাট নেয়মত মনে করিয়া আল্লাহর শোকর আদায়

করিবে। অথচ মনিবের এই প্রহার যদি স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে গোলাম পুনরায় সেই বেয়াড়াপনায় ফিরিয়া আসিয়া শোকর বর্জন করিবে।

মানবদেহে আল্লাহর নেয়মত

মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদকেই নেয়মত মনে করিয়া কেবল উহারই শোকর আদায় করিয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত অপরাপর বিষয়-সম্পদ ও জীবনযাত্রার হাজারো উপকরণকে যেন কিছুই মনে করা হয় না। অথচ মানুষের কেবল দেহটির দিকে নজর করিলেই দেখা যাইবে, আল্লাহ পাক মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গে এমন সব নেয়মত দান করিয়াছেন যে, উহার কোন একটি নেয়মতের শোকর আদায় করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

একদা এক দরিদ্র ব্যক্তি এক বুজুর্গের নিকট হাজির হইয়া অতীব বেদনার সহিত নিজের অভাব-অনটন ও নিঃস্বতার কথা প্রকাশ করিলে বুজুর্গ তাহাকে বলিলেন, তুমি কি দশ হাজার দেরহাম পাওয়ার বিনিময়ে অন্ধ হইয়া যাওয়া পছন্দ করিবে? লোকটি জানাইল, সে এই প্রস্তাবে সম্মত নহে। বুজুর্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি তুমি দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বোবা হইয়া যাইতে রাজী আছ? লোকটি এইবারও তাহার অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। অতঃপর বুজুর্গ লোকটি খোঁড়া হইয়া যাওয়া, উম্মাদ হইয়া যাওয়া ইত্যাদির বিনিময়ে দশ দশ হাজার দেরহামের প্রস্তাব করিলে লোকটি সরাসরি ঐ প্রস্তাব নাকোচ করিয়া দিল। এইবার বুজুর্গ বলিলেন, আল্লাহ পাক মাত্র কয়েকটি অঙ্গের মাধ্যমেই তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দেরহামের সম্পদ দান করিয়াছেন, উহার পরও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না?

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত ইবনে সাম্মাক (রহঃ) একবার এক খলীফার দরবারে তাশরীফ লইয়া গেলেন। খলীফা তখন একটি পেয়ালা হাতে পানি পান করিতেছিলেন। খলীফা বুজুর্গের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাকে কিছু নসীহত করুন। বুজুর্গ বলিলেন, হে খলীফা! মনে করুন, আপনি পিপাসার্ত এবং আপনার যাবতীয় বিষয় সম্পদের বিনিময়েই কেবল আপনি এক পেয়ালা পানি পাইতে পারেন। এমতাবস্থায় আপনি কি এক পেয়ালা পানির জন্য আপনার সমুদয় অর্থ-সম্পদ প্রদান করিতে সম্মত হইবেন? খলীফা বলিলেন, হাঁ, পানির জন্য আমি সকল কিছুই দিতে রাজী হইব। হযরত ইবনে সাম্মাক বলিলেন, পানির জন্য যদি আপনার গোটা রাজত্বও দিতে হয়, তবে আপনি কি তাহাও দিতে সম্মত হইবেন? খলীফা এইবারও বলিলেন, আমি তাহাতেও সম্মত হইব। এইবার হযরত ইবনে সাম্মাক (রহঃ) গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, যেই রাজত্বের মূল্য এক পেয়ালা পানির সমতুল্যও নহে, এমন রাজত্ব পাইয়া তুষ্ট হওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর দেওয়া এক ঢোক

পানি এমন নেয়মত যে, পিপাসার সময় উহার মূল্য গোটা পৃথিবীর রাজত্ব অপেক্ষাও বেশী।

সাধারণ মানুষ কেবল সেই সকল বিষয়কেই নেয়মত মনে করিয়া থাকে যাহা উপস্থিত ক্ষেত্রে মূল্যবান এবং বিশেষ বস্তু হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে আল্লাহর দেওয়া যেই সকল নেয়মত ব্যাপক ও সহজলভ্য হওয়ার কারণে উপস্থিত ক্ষেত্রে তেমন দামী নহে; সেইগুলিকে কোন নেয়মতই মনে করা হয় না। উপরে সহজলভ্য ও সর্বত্র বিরাজমান এই জাতীয় নেয়মতের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থলে সংক্ষেপে কিছু বিশেষ বিশেষ নেয়মতের উল্লেখ করা হইতেছে।

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে প্রতিটি মানুষই নিজের মধ্যে এমন এক বা একাধিক নেয়মতের সন্ধান পাইবে যাহা বিশেষভাবে তাহার জন্যই নির্দিষ্ট এবং ঐ নেয়মতের সঙ্গে অপর কাহারো সংশ্লিষ্টতা নাই। এইরূপ তিনটি নেয়মতের কথা কাহারো পক্ষেই অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। যেমন– বুদ্ধি, চরিত্র এবং এলেম বা জ্ঞান। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় কম-বেশী সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।

বুদ্ধি ঃ বুদ্ধি বা আকল সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হইল–

هر کس را عقل خود بکمال نماید

অর্থাৎ– "সকলেই নিজের বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ মনে করে।"

মোটকথা, এমন কোন মানুষ পাওয়া যাইবে না, যে নিজেকে অপরের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান মনে না করে এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় সন্তুষ্ট নহে। এই কারণেই আল্লাহ পাকের নিকট কেহই বুদ্ধি চাহিয়া দোয়া করে না। তবে ইহাকেও আদর্শ বুদ্ধি ও সুবিবেচনার মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে যে, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিহীন নির্বিশেষে সকলেই উহাতে সন্তুষ্ট। প্রতিটি মানুষই যখন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী অন্য সকল অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, সুতরাং বাস্তবেও যদি এইরূপ হয়, তবে তো এই নেয়মতের জন্য তাহার পক্ষে শোকর করা ওয়াজিব। আর বাস্তবে এইরূপ না হইলেও শোকর করা ওয়াজিব হইবে। কারণ, সে তো নিজেকে ঐ নেয়মতের অধিকারী মনে করিতেছে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ–

মনে কর, কোন ব্যক্তি মাটির নীচে কোথাও বেশ কিছু ধন-রত্ন পুতিয়া রাখিয়া উহার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করিতেছে। এখন লোকটির অজ্ঞাতে যদি ঐ ধন-রত্ন তথা হইতে সরাইয়া ফেলা হয় এবং এই বিষয়ে সে কিছুই জানিতে না পারে, তবে উহার

অবর্তমানেও সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও শোকর অব্যাহত থাকিবে। কারণ, বাস্তবে তথায় ঐ সম্পদ না থাকিলেও আপন বিশ্বাস অনুযায়ী এখনো সে নিজেকে ঐ সম্পদের অধিকারী মনে করিতেছে এবং এই কারণেই শোকর আদায় করিতেছে।

চরিত্র ঃ এই ক্ষেত্রেও মানুষের স্বভাব যেন বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই অপরের মধ্যে কিছু দোষ-ত্রুটি দেখিতে পায় এবং ঐগুলিকে অপছন্দ করে। আর নিজেকে ঐ সকল দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত মনে করে । সুতরাং এই ক্ষেত্রেও মানুষের শোকর করা কর্তব্য যে, আল্লাহ পাক তাহাকে সুন্দর স্বভাব দান করিয়াছেন এবং অন্য সকলকে মন্দ স্বভাব দিয়াছেন।

এলেম বা জ্ঞান ঃ প্রতিটি মানুষই নিজের এমন কিছু গোপন বিষয়ের এলেম রাখে যাহা অপর কাহারো জানা নাই। নিজের গোপন বিষয়ের এই এলেমে তাহার সঙ্গে অপর কেহ শরীক নাই। অর্থাৎ তাহার এই গোপন বিষয়ের খবর যদি অপরাপর লোকেরাও জানিতে পারিত তবে তাহার অপমানের কোন অন্ত থাকিত না। মোটকথা, প্রতিটি মানুষকেই এমন বিশেষ কিছু বিষয়ের এলেম দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ এলেম অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

সুতরাং আল্লাহ পাক যে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ অপর সকলের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও তাহার দোষগুলি জানিতে দেন নাই এবং অপর সকরের নিকট কেবল তাহার ভাল গুণগুলিকেই প্রকাশ করিয়াছেন– এই কারণে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা কর্তব্য।

আল্লাহ পাক মানুষকে বহুবিধ নেয়মত দান করিয়াছেন। যেমন দৈহিক সৌন্দর্য, চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য, আত্মীয়-বান্ধব, সন্তানাদি, বসবাসের জন্য ঘর ইত্যাদি। এখন মনে কর, কোন মানুষকে যদি এই প্রস্তাব করা হয় যে, তোমাকে যেই নেয়মত দেওয়া হইয়াছে তাহা ছিনাইয়া লওয়া হইবে এবং উহার পরিবর্তে অপর মানুষকে প্রদত্ত নেয়মত তোমাকে দেওয়া হইবে, তবে এই প্রস্তাবে কেহই সম্মত হইবে না। অর্থাৎ কোন মানুষই নিজের অবস্থার বিনিময়ে অপরের অবস্থা গ্রহণ করিতে রাজী নহে। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে যেই খাস ও বিশেষ নেয়মত দান করিয়াছেন তাহা অপরকে দান করেন নাই এবং সকলেই নিজের বিশেষ নেয়মতকে অপরের নেয়মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে। এই কারণেই মানুষ নিজের অবস্থার বিনিময়ে অপরের অবস্থা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। সুতরাং নিজের অংশে প্রাপ্ত যেই নেয়মতকে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ মনে করা হইতেছে, উহার জন্য সকলেরই শোকর আদায় করা কর্তব্য।

শোকর আদায়ে অভ্যস্থ হওয়ার উপায়

এখন প্রশ্ন হইল, নেয়মতের শোকর করার এতসব উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ শোকর আদায় করিতেছে না কেন। উহার জবাবে আমরা বলিব, জাহেরী-বাতেনী, বিশেষ ও সাধারণ এবং সহজলভ্য ইত্যাদি নেয়মতসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতাই শোকর আদায়ের পথে প্রধান অন্তরায়।

এক্ষণে আমরা অবহেলায় নিমগ্ন ও গাফেল অন্তরসমুহের এস্লাহ্ ও আত্মসংশোধনের এলাজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব। আমরা আশা করি, এই সকল বিবরণ পাঠে গাফেলদের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে এবং তাহারাও নেয়মতের শোকর আদায়ে তৎপর হইবে। বিজ্ঞ ও সচেতন অন্তরসমূহের এলাজ এই যে, উপরে আমরা সাধারণ ও সহজলভ্য নেয়মতসমূহের যেই বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলির উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করিবে। আর যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ নেয়মত ছাড়া আল্লাহ পাকের অপরাপর দানসমূহকে কোন নেয়মতই মনে করে না, তাহাদের এলাজ ও চিকিৎসার উপায় হইল, তাহারা নিজেদের তুলনায় হীন ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অবস্থার প্রতি নজর দিবে। এই প্রসঙ্গে এক বুজুর্গের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

এক বুজুর্গ প্রতিদিন হাসপাতাল, গোরস্তান এবং এমন জায়গায় গমন করিতেন যেখানে বিভিন্ন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই সকর স্থানে যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল যেন বিবিধ দুঃখ-দুর্ভোগ ও পীড়িত মানুষের অবস্থা দেখিয়া নিজের স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও সুখকর অবস্থার কথা মনে পড়িয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণপূর্বক আত্মসংশোধন এবং আল্লাহর নেয়মতের শোকর আদায় করার সুযোগ ঘটে।

বুজুর্গ হাসপাতালে গিয়া নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের করুণ অবস্থা দেখিয়া নিজের সুস্থতা ও নিরাপত্তার কথা কল্পনা করতঃ আল্লাহর শোকর আদায় করিতেন। অপরাধীদের স্থানে গিয়া দেখিতে পাইতেন, ভয়ানক কোন অপরাধের কারণে কাহারো হয়ত ফাঁসির আদেশ হইয়াছে কিংবা চুরির অপরাধে হয়ত কাহারো হস্ত কর্তনের আয়োজন চলিতেছে। অর্থাৎ এইভাবে বিভিন্ন অপরাধের কারণে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মেয়াদী শাস্তি হইতেছে বা শাস্তির অপেক্ষায় প্রহর গুণিতেছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া তিনি মনে মনে আল্লাহর শোকর আদায় করিতেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে এই জাতীয় অপরাধ ও শাস্তি হইতে হেফাজত করিয়াছেন।

গোরস্তানে গিয়া তিনি কবরবাসীদের অবস্থা কল্পনা করিয়া মনে মনে বলিতেন, হে মন! একবার ভাবিয়া দেখ, আজ যাহারা এখানে কবরবাসী

হইয়াছে, একদিন তাহারাও তোমার মত জীবিত ছিল। কিন্তু আজ তাহারা অসহায় অবস্থায় কবরে শায়িত আছে। তাহারা অন্ততঃ একটি দিনের জন্য হইলেও পুনর্জীবিত হইয়া দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের দুরাকাংখা করিতেছে। কবরের কঠিন আজাবে নিপতিত হইয়া এইরূপ আশা করিতেছে যে, অন্ততঃ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাইলে নিজের অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ করিয়া আসিবে। কবরের অধিবাসীরা আজ যেই সামান্য সুযোগ লাভের আশায় বুক-ফাটা চিৎকার করিতেছে; বর্তমানে তুমি সেই অমূল্য সুযোগ ভোগ করিতেছ। সুতরাং হেলায় আর সুযোগ নষ্ট করিও না। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। অন্যথায় একদিন তোমাকেও এইরূপ অনুতাপ করিতে হইবে। কিন্তু তখন শত অনুতাপ করিয়াও কোন কাজ হইবে না। এই তো গেল পাপীদের অবস্থা। কবর জগতে নেককারদেরও অনুশোচনার কোন অন্ত নাই। তাহারা আজ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, হায়! দুনিয়াতে আমি যদি আরো বেশী নেক আমল করিতাম, তবে আজ আমার পরিণতি আরো অধিক সুখকর হইত। অথচ দুনিয়ার জীবনে কত প্রচুর সুযোগ আমি হেলায় নষ্ট করিয়া দিয়াছি।

মোটকথা, কবর জেয়ারতের সময় কবরবাসীদের অবস্থা কল্পনা করিয়া জেয়ারতকারী যখন জানিতে পারিবে যে, কবরের অধিবাসীগণ বদকার হউক কিংবা নেককার, সকলেই পৃথিবীতে পুনরাগমনের সুযোগ লাভের যেই প্রত্যাশা করিতেছে, আজ সেই সুযোগ আমাদের হাতে, আমরা এখনো জীবিত। আমাদের জীবনের বিরাট অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে। এই সুযোগে ইচ্ছা করিলে আমরা বিগত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা অধিক নেক আমলে তৎপর হইতে পারি। সুতরাং জীবনের যেই কয়টি দিন অবশিষ্ট আছে, উহাকে আল্লাহর দেওয়া বিরাট সুযোগ মনে করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। অর্থাৎ এইভাবেই মানুষ যখন আল্লাহর দেওয়া জীবনরূপ সম্পদকে নেয়মত মনে করিবে, তখন এই নেয়মতের শোকরও আদায় করিবে। এই নেয়মতের শোকর হইল, আল্লাহ পাক যেই উদ্দেশ্যে জীবন দান করিয়াছেন উহাকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। আশা করা যায়, এই পদ্ধতির চিকিৎসা দ্বারা গাফেল লোকদের অন্তরে আল্লাহর নেয়মতের উপলব্ধি সৃষ্টি হইয়া শোকর করার তওফীক হইবে।

হযরত রবী ইবনে খায়ছাম একজন পূর্ণাঙ্গ অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত উপরোক্ত পদ্ধতির উপর আমল করিতেন। তিনি নিজের ঘরে একটি কবর খনন করিয়া লইয়াছিলেন এবং প্রত্যহ গলায় একটি বেড়ি পরিধান করিয়া সেই কবরে শয়ন করতঃ নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতেন–

رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا

অর্থাৎ– আয় পরওয়ারদিগার! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ কর, যেন আমি সৎকর্ম সম্পাদন করিতে পারি। (সূরা মুমীনুল – ৯৯-১০০ আয়াত)

অতঃপর তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, হে রবী! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে (অর্থাৎ তুমি যেন কবর হইতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছ)। এখন তোমার কিছু করার থাকিলে তাহা সম্পন্ন করিতে পার, সেই সময় আসিবার পূর্বে, যখন তুমি পুনর্বার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের আবেদন করিবে কিন্তু তোমার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইবে।

যাহারা আল্লাহর নেয়মতের শোকর করে না এবং উহা হইতে দূরে থাকে, তাহাদের চিকিৎসার একটি উপাদান হইল এই কথা জানিয়া লওয়া যে, আল্লাহ পাকের যেই নেয়মতের শোকর আদায় করা হয় না, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পুনর্বার উহা ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই কারণেই প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ বলিতেন, হে লোকসকল! তোমরা অবশ্যই আল্লাহ পাকের নেয়মতের শোকর আদায় করিও। কেননা, এইরূপ হওয়া খুবই বিরল যে, একবার নেয়মত চলিয়া যাওয়ার পর পুনর্বার উহা ফেরৎ আসিয়াছে। এক বুজুর্গ বলিয়াছেন, নেয়মত যেন বন্য পশুর মত। সুতরাং শোকরের লাগাম দ্বারা উহাকে বন্দী করিয়া রাখ। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– যখন কাহারো উপর আল্লাহ পাকের প্রচুর নেয়মত নাজিল হয়, তখন তাহার প্রতি মানুষের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। তখন সে যদি এই সকল প্রয়োজন পূরণে অলসতা প্রদর্শন করে, তবে সে যেন প্রকারান্তরে সেই নেয়মত হারাইয়া ফেলারই প্রয়াস চালায়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ– নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (সূরা রা-আদ – ১১ আয়াত)

একই বিষয়ে সবর ও শোকরের সহাবস্থান

এখানে পাঠকের মনে হয়ত এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, উপরে উপস্থাপিত বিবরণের আলোকে ইহাই মনে হইতেছে, যেন পৃথিবীর সকল বস্তুতেই আল্লাহর নেয়মত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সকল বস্তু আল্লাহর নেয়মত সাব্যস্ত হইলে স্বাভাবিকভাবেই ইহা আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, উহাতে কোন মুসীবতের অস্তিত্ব থাকিবে না। এখন প্রশ্ন হইল, যদি মুসীবত না থাকে, তবে সবর করা হইবে কিসের উপর? পক্ষান্তরে যদি মুসীবত বিদ্যমান থাকে তবে কিরূপে শোকর হইবে? কারণ, মুসীবতের উপর সবর করার সঙ্গে কষ্ট

বিদ্যমান। এদিকে শোকর হইল আনন্দজ্ঞাপক। সুতরাং সবর ও শোকর হইল পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতধর্মী দুইটি বিষয়। একই বস্তুতে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয়ের সহাবস্থান কেমন করিয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আসলে একই বিষয়ে নেয়মত ও মুসীবত উভয়ই বিদ্যমান। কারণ, কোন বিষয়ে যদি নেয়মতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে একই সঙ্গে মুসীবতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, এই দুইটি বিষয় একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং মুসীবত দূর হওয়াকে নেয়মত এবং নেয়মতের অনুপস্থিতিকে মুসীবত বলা হইবে। অর্থাৎ উভয়টির অস্তিত্বই জরুরী।

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, নেয়মত দুই প্রকার। একটি হইল সাধারণ বা সর্বাবস্থায় নেয়মত। এই নেয়মত ইহকাল বা পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই হইতে পারে। ইহকালের নেয়মত হইল ঈমান ও সচ্চরিত্র ইত্যাদি। পরকালের নেয়মত যেমন– আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়া। দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা এক বিবেচনায় নেয়মত এবং অপর বিবেচনায় মুসীবত। যেমন, অর্থ-সম্পদ। ইহা দ্বারা যদি ধর্মীয় কল্যাণ সাধন হয় তবে ইহা নেয়মত। আর ধর্মের অনিষ্ট হইলে ইহা মুসীবত বটে।

অনুরূপভাবে মুসীবতও দুই প্রকার। প্রথমতঃ যাহা সকল বিবেচনায় ও সর্বাবস্থায় মুসীবত। এই মুসীবতও ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত হইতে পারে। ইহকালের এই সার্বক্ষণিক মুসীবত হইল কুফরী ও অসচ্চরিত্রতা। আর পরকালের এই মুসীবত হইল আল্লাহ হইতে দূরে থাকা। দ্বিতীয়তঃ যাহা এক বিবেচনায় মুসীবত কিন্তু অন্য বিবেচনায় মুসীবত নহে। যেমনঃ রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য ও ভয়-ভীতি।

মোটকথা, যাহা সর্বাবস্থায় নেয়মত, উহার শোকরও সর্বাবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে পার্থিব জীবনে যাহা সকল বিবেচনায় মুসীবত, উহার উপর সবর করার হুকুম নাই। যেমন 'কুফরী' পার্থিব জীবনের একটি সার্বিক মুসীবত। সুতরাং ইহার জন্য সবর করার কোন অর্থ হয় না। বরং কাফেরের কর্তব্য কুফরী পরিত্যাগ করা, কুফরীর উপর সবর করা নহে। অনুরূপভাবে গোনাহগারের কর্তব্য, গোনাহ ত্যাগ করা। অবশ্য এই কথা যুক্তিগ্রাহ্য যে, অনেক সময় কাফের ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, আমি কুফরী করিয়া অন্যায় করিতেছি। যেমন মূর্ছাগত ব্যক্তি মুর্ছিত হওয়ার পর নিজের ব্যাধি সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারে না এবং উহার কারণে তাহার কোন কষ্টও হয় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সবর করাও তাহার কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু একজন গোনাহগার নিজের অপরাধ সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত। সুতরাং এই গোনাহ পরিত্যাগ করা তাহার উপর ওয়াজিব। মানুষ যেই মুসীবত দূর করিতে সক্ষম

নহে, সেই মুসীবতের উপর সবর করিতে হুকুম করা হয় নাই। যেমন, এক ব্যক্তি প্রচণ্ড পানির পিপাসা থাকা সত্ত্বেও পানি পান করিতেছে না এবং উহার কারণে তাহার জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হইতেছে। তো এই ক্ষেত্রে পানি পান করা হইতে বিরত থাকার ফলে সৃষ্ট মুসীবতের উপর সবর করার অনুমতি নাই। বরং এই ক্ষেত্রে পিপাসার মুসীবত দূর করাই সঙ্গত বিধান।

মোটকথা, এমন কষ্ট ও মুসীবতের উপরই সবর করিতে বলা হইয়াছে, যেই মুসীবত দূর করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, দুনিয়াতে যাহা সর্বক্ষেত্রে মুসীবত, উহার উপর সবর করা সঙ্গত নহে। কেননা, এমনও হইতে পারে, যেই মুসীবতের উপর সবর করা হইতেছে, অন্য কোন বিবেচনায় উহা হয়ত নেয়মত হইবে। অর্থাৎ একই বিষয়ে মুসীবত ও নেয়মত একত্রিত হইতে পারে– যদি উহা এমন বিষয় হয় যাহা এক বিবেচনায় মুসীবত এবং অন্য বিবেচনায় নেয়মত। যেমন ধনাঢ্যতা মানুষের জন্য নেয়মত বটে, কিন্তু এই ধনের কারণেই অনেক সময় ধনী ব্যক্তি স্ত্রী-পরিজনসহ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়। সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর নেয়মত বটে। কিন্তু এই সুন্দর-সুঠাম দেহটি যদি কাহারো হিংসার নজরে পতিত হয় তবে এই স্বাস্থ্যই স্বাস্থ্যহানী বা ক্ষেত্রবিশেষ প্রাণহানীরূপ মুসীবতের কারণ হইতে পারে। অর্থাৎ এইভাবেই দুনিয়াতে যত নেয়মত আছে উহা নেয়মত হওয়ার জন্য মুসীবতের কারণ হইতে পারে এবং যত পার্থিব মুসীবত আছে, ক্ষেত্রবিশেষে উহা মুসীবতওয়ালার জন্য নেয়মতের কারণ হইতে পারে। যেমন দুনিয়াতে এমন বহু মানুষ আছে যাহারা রোগ-ব্যাধি ও দরিদ্রতা পছন্দ করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে এই দুইটি বিষয় মুসীবত বলিয়া গণ্য হইলেও তাহারা উহা পছন্দ করার কারণ হইল, যখন মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, তখন এই দুইটি উপাদানের প্রভাবে মানুষ ভোগ-বিলাসে জড়াইয়া আল্লাহর নাফরমানীর পথে ধাবিত হইয়া থাকে। যেমন কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ– যদি আল্লাহ তাঁহার সকল বান্দাকে প্রচুর রিজিক দিতেন, তবে তাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত। (সূরা শুরা – ২৭ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ

অর্থাৎ– সত্যি সত্যি মানুষ সীমা লংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নিজ মোমেন বান্দাকে পার্থিব স্বচ্ছলতা হইতে বাঁচাইয়া রাখেন– যদিও তিনি তাহাদিগকে মোহাব্বত করেন। যেমন লোকেরা নিজেদের রোগীকে পানি হইতে বাঁচাইয়া রাখে। অনুরূপভাবে পার্থিব নেয়মতসমূহের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনদের অবস্থাও এইরূপ।

ইতিপূর্বে আমরা ষোল প্রকার নেয়মতের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা। তবে অনেকের ক্ষেত্রে ঈমান এবং সচ্চরিত্রতাও মুসীবতের কারণ হইতে পারে। সুতরাং এই দুইটি বিষয় যেই ক্ষেত্রে মুসীবত সাব্যস্ত হইবে, সেই ক্ষেত্রে ইহাও আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, উহার বিপরীত অবস্থা নেয়মত হইবে। যেমন ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, মারেফাত (তথা কোন বিষয়ের সঠিক জ্ঞান ও পরিচয়) একটি পূর্ণাঙ্গ নেয়মত। কেননা, ইহা আল্লাহ পাকের সিফাতসমূহের মধ্য হইতে একটি সিফাত। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে এই নেয়মতই ভয়ানক মুসীবতের কারণ হইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে বরং এই মারেফাত ও জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতাই নেয়মতরূপে গণ্য হইবে। যেমন মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। কেহই বলিতে পারে না যে, কার মৃত্যু কখন আসিবে। প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান যদিও নেয়মত, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অজ্ঞতাই নেয়মত। কারণ, কোন মানুষ যদি কোন ক্রমে নিজের মৃত্যুর দিনক্ষণ জানিয়া ফেলিতে পারে, তবে মৃত্যুর কঠিন দুর্ভাবনায় সে এমনই হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে যে, অতঃপর তাহার জীবন বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এমনিভাবে নিজের সম্পর্কে এবং আত্মীয়দের অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ইহাও নেয়মত। কেননা, ইহা জানা হইয়া গেলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস লোপ পাইয়া তদস্থলে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে এবং একে অপরের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সোচ্চার হইয়া এক বিপর্যয়কর অবস্থার উদ্ভব হইবে।

অনুরূপভাবে অপরের দোষ-ক্রটি না জানা ইহাও এক নেয়মত। কারণ অপরের দোষ জানা হইয়া গেলে তাহার সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হইবে এবং ইহার সূত্র ধরিয়াই সেই ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিয়া দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ করা হইবে। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অপর ব্যক্তির ভাল গুণসমূহ না জানাও নেয়মতের মধ্যে গণ্য হয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, অকারণেই অপর কাহারো ক্ষতিসাধন কিংবা তাহার মানহানীর চেষ্টা করিয়া থাকে। এখন মনে কর, যেই ব্যক্তির ক্ষতি করা হইতেছে, তিনি যদি আল্লাহর ওলী হইয়া থাকেন তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অবস্থায় তাহাকে কষ্ট দিলে যেই গোনাহ হইবে; তাহার পরিচয় জানার পর কষ্ট দিলে তদপেক্ষা বেশী গোনাহ হইবে। অর্থাৎ আল্লাহর কোন নবী এবং তাঁহাদের পরিচয় না জানিয়া কষ্ট দেওয়া– এই দুইয়ের মধ্যকার ব্যবধান সুস্পষ্ট। এই কারণেই আল্লাহ পাক কেয়ামত কায়েম হওয়ার নির্দিষ্ট সময়, লাইলাতুল ক্বদর এবং জুমুআর দিন দোয়া কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি গোপন রাখিয়াছেন। কারণ, এই ক্ষেত্রে ইহা না জানার কারণে অধিক চেষ্টা-সন্ধান করিতে হয় বলিয়া অধিক ছাওয়াব হাসিল হয়।

পার্থিব বিপদে শোকর ও পারলৌকিক ছাওয়াবের প্রত্যাশা

পার্থিব জীবনে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তখন এই বলিয়া শোকর আদায় করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমার দ্বীন-ঈমান হেফাজত করিয়াছেন। পার্থিব বিপদ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখেরাতের বিপদের কোন অন্ত নাই। আল্লাহ পাক আমাকে পরকালের স্থায়ী বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার শোকর আদায় করিতেছি।

এক ব্যক্তি হযরত সহল তশতরী (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমার ঘরে চোর ঢুকিয়া আমার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। হযরত সহল বলিলেন, শয়তান যদি তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তোমার ঈমানরূপ সম্পদ হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তবে তোমার কি দশা হইত? সুতরাং তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কিছু ছামান হরণ হইলেও তোমার ঈমানরূপ অমূল্য সম্পদ যে রক্ষা পাইয়াছে, এই কারণে তোমার শোকর করা উচিত।

হযরত ঈসা (আঃ) এইরূপ দোয়া করিতেন, ইলাহী! আমার কোন মুসীবত যেন আমার দ্বীনের উপর আপতিত না হয়।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমার উপর যত মুসীবতই আসিয়াছে, ঐ মুসীবত দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে চারিটি পুরস্কারও দান করিয়াছেন। যেমন– (১) সেই মুসীবত দ্বারা আমার দ্বীন আক্রান্ত হয় নাই। (২) উহা নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত হয় নাই। (৩) ঐ মুসীবতের উপর রাজী থাকা হইতে আমাকে বঞ্চিত করা হয় নাই। (৪) আপতিত মুসীবতের উপর আমি ছাওয়াবের প্রত্যাশা করিয়াছি।

জনৈক আধ্যাত্ম পথের পথিক এক বুজুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিত। একবার কি কারণে বাদশাহ তাহাকে বন্দী করিলে সে লোক মারফৎ ঐ বুজুর্গের নিকট তাহার অবস্থা বলিয়া পাঠাইলেন। জবাবে বুজুর্গ তাহাকে জানাইলেন, তুমি

আল্লাহর শোকর কর। কয়েক দিন পর বাদশাহ সেই বন্দীকে ভিষণ শাস্তি দেওয়ার পর সে পুনরায় বুজুর্গের নিকট এই সংবাদ জানাইল। সংবাদ পাইয়া বুজুর্গ জানাইলেন, তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর। ইতিমধ্যে বাদশাহর লোকেরা এক অগ্নিপুজককে আটক করিয়া আনিয়া সেই বন্দীর সঙ্গে একই শিকলে বাঁধিয়া রাখিল। এই নবাগত বন্দীটি ছিল পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। কিছুক্ষণ পর পরই তাহার এস্তেন্জার হাজত হইত। সুতরাং শিকলের অপর প্রান্তে বাঁধা সেই পূর্বোক্ত বন্দীটিকেও তাহার সঙ্গে পায়খানার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সে এই নূতন উপদ্রবের কথা বুজুর্গকে জানাইলে তিনি আগের মতই বলিয়া পাঠাইলেন, আল্লাহর শোকর আদায় কর। এইবার সে অতিষ্ঠ হইয়া বুজুর্গকে লিখিয়া পাঠাইল, আমি আর কত শোকর করিব? মানুষের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা বড় মুসীবত আর কি হইতে পারে?

এইবার বুজুর্গ জবাব পাঠাইলেন, হে আল্লাহর বান্দা! কারাগারের নানাবিধ যাতনায় তুমি অতিশয় মুসীবতে আছ বটে, কিন্তু একবার তোমার সঙ্গের ঐ হতভাগ্য বন্দীটির কথা ভাবিয়া দেখ; আজ তাহার কোমরের ঐ পৈতাটি যদি তোমার কোমরে জড়ানো থাকিত, তবে তোমার কি উপায় হইত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সুতরাং আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, তিনি তোমাকে ঈমানের দৌলত দান করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, কোন বিপদগ্রস্ত মানুষ যদি একটু গভীরভাবে এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখে যে, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে যেই ক্রটি করিতেছি, সেই হিসাবে আমার উপর আপতিত মুসীবত বরং খুব কমই হইয়াছে। অর্থাৎ আমি যেই পরিমাণ অপরাধ করিতেছি, সেই হিসাবে আমার শাস্তি আরো কঠিন হওয়াই সঙ্গত ছিল। মোটকথা, বিষয়টাকে যদি এইভাবে চিন্তা করা হয় তবে এই মুসীবতও শোকরের উপকরণের মধ্যেই গণ্য হইবে।

হযরত ইয়াজীদ বোস্তামী (রহঃ) পথ অতিক্রম কালে উপর হইতে কেহ তাহার মাথায় ছাইয়ের ঝুড়ি নিক্ষেপ করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পতিত হইয়া আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিলেন। লোকেরা অসময়ে এই সেজদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি তো আমার মাথায় আগুন পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। এক্ষণে তদস্থলে শুধু ছাই নিক্ষিপ্ত হওয়া ইহা আমার জন্য নেয়মত বটে। আমি সেই নেয়মতেরই শোকর আদায় করিলাম।

একবার কোন এক দেশে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে প্রচণ্ড খড়া দেখা দিয়াছিল। এই সময় লোকেরা সেই অঞ্চলের এক বুজুর্গের নিকট গিয়া বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন করিলে তিনি বলিলেন, তোমরা বৃষ্টি বর্ষণে 'বিলম্ব' হইতেছে

বলিয়া মনে করিতেছ; আর আমি আকাশ হইতে পাথর বর্ষণে বিলম্ব হইতেছে কেন তাহা ভাবিতেছি। অর্থাৎ বুজুর্গ মনে করিতেন, আমাদের আমল-আখলাকের এমনই অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণই সঙ্গত ছিল। আর এই পাথর বর্ষণে বিলম্ব হওয়াকে তিনি নেয়মত মনে করিয়া শোকর আদায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতে সম্মত হন নাই।

এখন কেহ যদি এই কথা বলে যে, মুসীবতের শিকার হওয়ার পর আমরা কেমন করিয়া স্বস্তি বোধ করিব? অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনেকে হয়ত আমাদের তুলনায় অনেক বেশী গোনাহ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের উপর কোন মুসীবত আসিতেছে না। কাফেররা ক্রমাগত কুফরীতে লিপ্ত থাকার পরও তাহাদের উপর আমাদের মত মুসীবত আসিতেছে না। উহার জবাব এই যে, কাফেররা অপরাধ করিয়াও খুব সুখে আছে এমন নহে; বরং তাহাদের জন্য এক কঠিন মুসীবত অপেক্ষা করিতেছে। আজ না হয় কাল মৃত্যুর পর তাহাদিগকে সেই মুসীবত ভোগ করিতেই হইবে। দুনিয়াতে তাহাদিগকে এই কারণে সুযোগ দেওয়া হইতেছে যেন অধিক অপরাধের কারণে দীর্ঘ শাস্তি দেওয়া যায়। এই মর্মে কালাম পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

অর্থাৎ– "আমি কাফেরদিগকে এই কারণে অবকাশ দেই, যেন তাহাদের গোনাহ বাড়িয়া যায়।"

আর অপরাপর লোকদের গোনাহ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, ইহা কেমন করিয়া জানা গেল যে, অনেকে আমাদের তুলনায় বেশী গোনাহ করিতেছে? কারণ, কেবল বাহ্যিক গোনাহকেই গোনাহ মনে করিলে চলিবে না। আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত প্রশ্নে অনেকের অন্তরের কালিমা ও ধৃষ্টতা এমনই জঘন্য যে, উহার তুলনায় যেন প্রকাশ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচার কোন পাপই নহে। এই প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ– তোমরা ইহাকে সহজ মনে করিতেছ অথচ আল্লাহর নিকট ইহা গুরুতর অপরাধ। (সূরা নূর – ১৫ আয়াত)

সুতরাং এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কিছুমাত্র উপায় নাই যে, অপরাপর লোকেরা আমি অপেক্ষা অধিক গোনাহ করিতেছে। আর বাস্তবেও যদি অপর কাহারো গোনাহ অধিক হইয়া থাকে, তবে তাহাকেও হয়ত পরকালে বেশী

শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরং এই ক্ষেত্রেও তো মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি এই কারণে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিৎ যে, দুনিয়ার সামান্য মুসীবতের বিনিময়ে তাহাকে পরকালের কঠিন আজাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আর গোনাহগারদের শাস্তি পরকালের জন্য মুলতবী রাখা হইয়াছে। তাছাড়া দুনিয়ার মুসীবতের ক্ষেত্রে উহার তীব্রতা হ্রাস কিংবা মুসীবতের যাতনা ভোগের পাশপাশি সান্ত্বনা লাভেরও বহুবিধ উপকরণ মওজুদ আছে। কিন্তু পরকালের শাস্তির অবস্থা হইল, প্রথমতঃ উহা স্থায়ী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ স্থায়ী না হইলেও উহার মাত্রা হ্রাস কিংবা শাস্তির পাশাপাশি সান্ত্বনা লাভের কোন উপকরণ সেখানে বিদ্যমান নাই। এদিকে হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে, দুনিয়াতে একবার কাহারো পাপের শাস্তি হইয়া যাওয়ার পর আখেরাতে আর তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মানুষ কোন গোনাহ করার পর যদি তাহার উপর কোন কঠিন মুসীবত অপতিত হয়, তবে আল্লাহ পাক তাহাকে পুনরায় শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকেন।

মুসীবতের ভিতরও সান্ত্বনা লাভ ও শোকর আদায়ের অপর কারণ হইল, ইহা লওহে মাহফুজে লিখিত ছিল যে, অমুকের উপর এই পরিমাণ মুসীবত আসিবে। সুতরাং উহার আগমন ছিল অপরিহার্য। অর্থাৎ যাহা রহিত হওয়ার কোন সুযোগই নাই, তাহা ঘটিয়া যাওয়াই নেয়মত বটে। তা ছাড়া মুসীবতের বিনিময়ে যেই ছাওয়াব দেওয়া হইবে, উহা মুসীবতের তুলনায় অনেক বেশী হইবে। একটু ভাবিয়া দেখ, রোগীর নিকট ঔষধ তিক্ত মনে হইলেও তাহার জন্য উহা নেয়মত বটে। অনুরূপভাবে শিশুদেরকে অসঙ্গত খেল-তামাশা হইতে বিরত রাখাও তাহাদের জন্য নেয়মত। কারণ শিশুদেরকে যদি তাহাদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে তাহারা লেখা-পড়া ও আদব-আখলাক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে এবং তাহাদের জীবন বরবাদ হইবে।

অনুরূপভাবে মানুষের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখও অনেক সময় বরবাদীর কারণ হইয়া থাকে। বরং বিবেক-বুদ্ধি যাহা মানুষের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উহাও অনেক সময় মানুষের জন্য বরবাদী ও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কাফের মুশরিকরা তো তাহাদের এই বুদ্ধির কারণেই বিপথগামী হইতেছে। এই কারণেই কেয়ামতের দিন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি (বুদ্ধি-বিবেকহীন) পাগল বা অবুঝ বালক হইতাম, তবে ভাল হইত। আল্লাহর দ্বীনের প্রশ্নে আমরা নিজেদের আকল ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। মোটকথা, মানুষর জন্য যাহা কিছু ঘটে উহা দ্বারা তাহার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনও

হইতে পারে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের উপর সুধারণা পোষণপূর্বক সকল অবস্থাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করিয়া আল্লাহর শোকর আদায় করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ পাকের হেকমত বুঝিতে পারা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তাঁহার প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ। বান্দার জন্য কোন্ বিষয়টি ভাল হইবে তাহা তিনিই ভাল বোঝেন।

কেয়ামতের দিন বান্দা যখন পার্থিব জীবনের বিপদাপদের বিনিময়ে ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহারা আল্লাহর শোকর আদায় করিবে। যেমন শিশুরা বড় হওয়ার পর পিতামাতা এবং শিক্ষকের নেগ্‌রানী ও প্রহারের শোকর আদায় করিয়া থাকে। কারণ, তখন তাহারা শৈশবের সেই শাসন ও আদব-কায়দা শিক্ষাদানের ফল দেখিতে পায়। অনুরূপভাবে মানুষের উপর যেই বালা-মুসীবত আগত হয়, উহাকেও আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সতর্কীকরণ স্বরূপই মনে করিতে হইবে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি এরশাদ ফরমাইলেনঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমার উপর যেই হুকুম আগত হয়, উহাতে তুমি আল্লাহর উপর কোন খারাপ ধারণা পোষণ করিও না।

একদা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকাইয়া হাস্য করিলেন। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফরমাইলেন, এই বিষয়ে আমার তাজ্জব হয় যে, ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ পাকের কোন হুকুম যদি সুখকর হয় তখন তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হয় এবং উহা তাহাদের জন্য কল্যাণকর হয়। অনুরূপভাবে ঐ হুকুম যদি তাহাদের জন্য কষ্টকর হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেও তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং উহা তাহাদের জন্য কল্যাণকর হয়।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টাকে ভালভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। যাবতীয় পাপের মূল হইতেছে দুনিয়ার মোহাব্বত। আর নাজাতের মূল কথা হইল দুনিয়ার প্রতি অনীহা। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেওয়া নেয়মতসমূহ যদি নিজের চাহিদা অনুযায়ী এবং কোন প্রকার বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত ছাড়াই পাওয়া যায়, তবে দুনিয়ার প্রতি মন আরো বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় দুনিয়া যেন মানুষের জন্য জান্নাতের রূপ পরিগ্রহ করে। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনে যদি বিবিধ প্রকার বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত আপতিত হইতে থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রতি মনের আকর্ষণ হ্রাস পাইতে পাইতে এক পর্যায়ে দুনিয়া যেন কয়েদখানার মত মনে হইতে থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হাদীসে

পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ

অর্থাৎ– দুনিয়া হইল মোমেনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।

এমন ব্যক্তিকে 'কাফের' বলা হয়, যে আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল পার্থিব ভোগ-বিলাস ও দুনিয়ার জীবনকেই কামনা করিতে থাকে। আর মোমেন বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যার অন্তর দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং পারলৌকিক জীবনে গমনের প্রতি আগ্রহী থাকে।

মোটকথা, মুসীবতের মধ্যে নেয়মত সুপ্ত থাকার পাঁচটি কারণ উপরে বর্ণনা করা হইল। সুতরাং মুসীবতের মধ্যে নেয়মতের এই সংশ্লিষ্টতার কারণেই উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। তিক্ত ঔষধ সেবন কিংবা পঁচনশীল ক্ষতে চিকিৎসকের অস্ত্র সঞ্চালনে উপস্থিত কষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহার ফলে মানুষ রোগের কঠিন যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আরাম বোধ করে।

অনুরূপভাবে মনে কর, কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে বাদশাহর মহলে গমন করে এবং সে ইহাও ভালভাবে জানিতে পারে যে, এই মহল তাহার স্থায়ী নিবাস নহে এবং এক সময় অবশ্যই তাহাকে এই স্থল ত্যাগ করিতে হইবে; আর এমতাবস্থায় শাহী মহলের কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া সে যদি একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে– যেই দৃশ্য তাহার সঙ্গে যাইবার নহে, তবে ইহা তাহার জন্য এক মুসীবতের কারণ হইবে। কারণ, সে এমন এক স্থানে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে যেখানে সে অবস্থান করিতে পারিবে না।

অবশ্য উপরোক্ত অবস্থায় যদি তাহার অন্তরে এমন আশংকা থাকে যে, বাদশাহ আমার অবস্থা জানিতে পারিলে কঠিন শাস্তি দিবেন, তবে এই আশংকার কারণেই রাজ মহলের প্রতি সে ঘৃণা ও অনীহা ভাব পোষণ করিবে এবং ইহা তাহার জন্য নেয়মতের কারণ হইবে।

অনুরূপভাবে দুনিয়াও মানুষের জন্য একটি মহল বটে। লোকেরা অনুগ্রহের ফটক দ্বারা এই মহলে প্রবেশ করে এবং কবরের ফটক দ্বারা তথা হইতে প্রস্থান করে। এই অস্থায়ী মহলের সহিত মানুষের যেই পরিমাণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, সেই অনুপাতেই উহা তাহার জন্য মুসীবতের কারণ হইবে। আর এই অস্থায়ী নিবাসের সহিত যেই পরিমাণ নিস্পৃহভাব পোষণ করিবে, সেই অনুপাতেই উহা তাহার জন্য নেয়মতের কারণ হইবে। যেই ব্যক্তি বিষয়টাকে এইভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি মুসীবতের ভিতরও শোকর করিতে পারিবে। কিন্তু যেই ব্যক্তি মুসীবতের ভিতর সুপ্ত নেয়মতের সন্ধান পায় নাই, তাহার পক্ষে

বিপদাপদ ও মুসীবতের মধ্যে শোকর করা অসম্ভব বটে। কারণ, নেয়মতের পরিচয় পাওয়ার পরই উহার শোকর আদায় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেই ব্যক্তির এই বিশ্বাস নাই যে, মুসীবতের ছাওয়াব মুসীবত অপেক্ষা অধিক পাওয়া যাইবে, সে কেমন করিয়া শোকর আদায় করিবে?

পার্থিব বিপদের ছাওয়াব সম্পর্কে হাদীস ও মহাপুরুষগণের বাণী

পার্থিব জীবনের দুঃখ-দুর্ভোগ ও বালা-মুসীবত আপাত দৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হইলেও পরকালে উহার বরাবরে অফুরন্ত বিনিময় পাওয়া যাইবে। সুতরাং পার্থিব জীবনের বালা মুসীবতকে কোন অবস্থাতেই অকল্যাণকর মনে করিতে নাই। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক যাহার কল্যাণ করিতে চাহেন, তাহার উপর মুসীবত দেন।

এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার উপর দৈহিক, আর্থিক কিংবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত নাজিল করি। বান্দা যদি সেই মুসীবতের উপর উত্তমরূপে সবর করে, তবে কেয়ামতের দিন তাহার আমল পরিমাপ করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করিতে কিংবা তাহার আমলনামা খুলিতে আমি লজ্জাবোধ করিব।

অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দার উপর কোন মুসীবত আসিবার পর সে যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পাঠ করিবার পর এই দোয়া পড়ে–

اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ اَعْقِبْنِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

(অর্থাৎ– আয় আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবতের প্রতিদান দান করুন এবং উহার পশ্চাতে আমাকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করুন।) তবে আল্লাহ পাক তাহাই করিবেন।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন, আমি যেই ব্যক্তির উভয় চোখ অন্ধ করিয়া দেই, তাহার জন্যে উহার বিনিময় হইল, সে সর্বদা আমার ঘরে অবস্থান করিবে এবং আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমার শরীর অসুস্থ। জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, যেই ব্যক্তির সম্পদ বিনষ্ট হয় না এবং অসুস্থ হয় না, তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

আল্লাহ পাক যেই ব্যক্তিকে মোহাব্বত করেন তাহাকে বিপদে লিপ্ত করেন। আর যখন বিপদে লিপ্ত করেন তখন সবর করার শক্তি দান করেন।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট মর্তবার একটি স্তর থাকে। মানুষ নিজের আমল দ্বারা ঐ মর্তবায় পৌঁছাইতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহে কোন কষ্ট ও মুসীবত নাজিল করেন এবং উহার (উপর সবর করার) কারণে সে ঐ মর্তবা প্রাপ্ত হয়।

ছাহাবী হযরত খাব্বাব বিন ইরাত (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিলাম। এই সময় তিনি নিজের চাদর বিছাইয়া কাবা ঘরের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের সাহায্যের জন্য দোয়া করিতেছেন না কেন? এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনেককে মাটি খনন করিয়া গোড় দেওয়া হইত এবং করাত দিয়া তাহাদের মস্তক চিরিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এতকিছুর পরও তাহারা নিজেদের দ্বীন পরিত্যাগ করিত না।

হযরত আলী (রা) বলেন, কোন বাদশাহ যদি অন্যায়ভাবে কাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিবার পর যদি সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে সে শাহাদাত প্রাপ্ত হইবে। কিংবা প্রহারের কারণেও যদি তাহার মৃত্যু ঘটে, তবুও সে শহীদ হইবে।

ছাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমরা মৃত্যুর জন্য পয়দা হইয়াছ আর বিরান করার জন্য এমারত নির্মাণ করিতেছ। তোমরা এমন বস্তুর লোভ করিতেছ যাহা বিলীয়মান, আর এমন বস্তু বর্জন করিতেছ যাহা চিরস্থায়ী। দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু এই তিনটি বড় উত্তম বিষয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক যখন তাঁহার কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন এবং তাহাকে প্রিয় করিয়া লইতে চাহেন তখন তাহার উপর বৃষ্টির মত মুসীবত বর্ষণ করেন। এই সময় বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে, তখন ফেরেশতাগণ বলে, এই আওয়াজ তো পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর বান্দা যখন পুনরায় "ইয়া রব" বলিয়া আল্লাহকে ডাকে, তখন আল্লাহ

পাক বান্দার ডাকে সাড়া দিয়া বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি বলিতে চাহিতেছ, বল। আমি হাজির আছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে, তোমাকে প্রদান করিব। দুনিয়াতে তোমার নিকট হইতে যদি কোন উত্তম বস্তু পৃথক করিয়া দেই তবে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু আমার নিকট রাখিয়া দেই। কেয়ামতের দিন যখন আমলকারীগণ হাজির হইবে, তখন তাহাদের নামাজ, রোজা, দান, হজ্ব ইত্যাদি আমলসমূহ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হইবে এবং পরিপূর্ণ ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। কিন্তু যখন মুসীবতগ্রস্ত ও বিপদওয়ালাগণ হাজির হইবে, তখন তাহাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত করা হইবে না এবং তাহাদের আমলনামাও খোলা হইবে না। তাহাদিগকে এমনভাবে ছাওয়াব প্রদান করা হইবে, যেমন তাহাদের উপর মুসীবত বর্ষণ করা হইয়াছিল। এই সময় পার্থিব জীবনে যাহারা বালা-মুসীবত ও বিপদাপদমুক্ত ছিল তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া বলিবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দিয়া আমাদিগকে কাটা হইত এবং আমরাও বিপদগ্রস্তদের মত ছাওয়াব প্রাপ্ত হইতাম, তবে কতই না ভাল হইত। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(সূরা যুমার – ১০ আয়াত)

অর্থাৎ সবরকারীদিগকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, জনৈক পয়গম্বর আল্লাহ পাকের দরবারে নিবেদন করিলেন, এলাহী! মোমেন বান্দাগণ তোমার আনুগত্য করে এবং তোমার নাফরমানী ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকে, অথচ তাহাদিগকে তুমি দুনিয়ার ধন-সম্পদ হইতে দূরে রাখ এবং তাহাদের উপর নানা প্রকার বালা-মুসীবত নাজিল কর। পক্ষান্তরে কাফেররা তোমার আনুগত্য করে না এবং বিবিধ পাপকর্মে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, অথচ তাহাদিগকে তুমি বালা-মুসীবত হইতে দূরে রাখ এবং দুনিয়ার নাজ-নেয়মত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহাদিগকেই দান কর। ইহার রহস্য কি?

পয়গম্বরের উপরোক্ত নিবেদনের জবাবে আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করিলেন, বান্দা এবং বালা মুসীবত সবকিছুই আমার অধিকারে। আর সকলেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কোন মোমেন পাপ করিলে আমি এই কামনা করি, যেন মৃত্যুর পূর্বেই সে যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহলোকেই তাহার উপর নানা বিপদাপদ চাপাইয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও পবিত্র করিয়া লই। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তিও ইহলোকে কিছু পুন্যের কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং উহার বিনিময়ে আমি ইহলোকেই তাহাকে প্রচুর রিজিক, পর্যাপ্ত সুখ-সামগ্রী ও নানা ধন-সম্পদ দান করিয়া থাকি এবং বিপদাপদ হইতে

হেফাজত করি, যেন পরকালে আমার নিকট তাহার আর কোন প্রাপ্য অবশিষ্ট না থাকে। এমতাবস্থায় তাহার পাপের প্রাপ্য হইবে কেবল অনন্ত শাস্তি।

কথিত আছে, যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ

(সূরা নিসা – ১২৩ আয়াত)

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি মন্দকার্য করিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে। তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর আর কেমন করিয়া আনন্দ অনুভব হইবে? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কি অসুস্থ বা চিন্তাগ্রস্ত হও না? উহাতেই তোমার পাপের কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ ইহসংসারে রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-যাতনা ও বালা-মুসীবত হইল মোমেন লোকের পাপের শাস্তি।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে এইরূপ দেখিতে পাও যে, আল্লাহ পাক তাহার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করিতেছেন আর সে তাহার পাপ কর্মেই বহাল থাকিতেছে, তখন মনে করিবে, তাহাকে সুযোগ দেওয়া হইতেছে মাত্র। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا
اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ *

অর্থাৎ– অতঃপর তাহারা যখন ঐ উপদেশ ভুলিয়া গেল, যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। এমনকি যখন তাহাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তাহারা খুব গর্বিত হইয়া পড়িল, তখন আমি অকস্মাৎ তাহাদেরকে পাকড়াও করিলাম। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া গেল। (সূরা আন্‌-আম – ৪৪ আয়াত)

অর্থাৎ, লোকেরা যখন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কার্য সম্পাদন পরিত্যাগ করিল, তখন আল্লাহ পাক তাহাদের সম্মুখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার অবারিত করিয়া দিলেন। এই পর্যায়ে তাহারা যখন সুখ-সম্ভোগে মত্ত হইয়া পড়িল তখন সহসা একদিন একবারেই তাহাদিগকে পাকড়াও করিলেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এক ছাহাবী পথিমধ্যে জাহেলী যুগের

পরিচিতা এক মহিলার সাক্ষাত পাইয়া তাহার সঙ্গে কিছু কথা বলার পর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় তিনি বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া উক্ত মহিলার দিকে তাকাইতেছিলেন আর সামনে আগাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় একটি দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া তাহার মুখে যখম হইয়া গেল। পরে তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনাটি পেশ করিলে তিনি ফরমাইলেন, আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দার কল্যাণ চাহেন, তখন দুনিয়াতেই তাহার পাপের শাস্তি দিয়া দেন।

একদা হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পবিত্র কোরআনের এমন একটি আয়াতের সন্ধান দিতেছি, যাহা সকল আয়াত অপেক্ষা অধিক আশাব্যঞ্জক। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ *

(সূরা শুরা – ৩০ আয়াত)

অর্থাৎ– তোমাদের উপর যেই সকল বিপদাপদ পতিত হয়, তাহা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেন।

মোটকথা, পার্থিব জীবনে মানুষের উপর যত বালামুসীবত আপতিত হয়, উহা তাহাদের গোনাহেরই ফসল। আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতেই গোনাহের শাস্তি দিয়া দেন, তবে আখেরাতে আর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। আর দুনিয়াতে যদি ক্ষমা করিয়া দেন, তবে তাঁহার কৃপার দাবী ইহা নহে যে, পরকালে পুনরায় শাস্তি দিবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বান্দার দুইটি ঢোক আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। (১) ক্রোধের ঢোক, যাহা হেলেম বা সহনশীলতা দ্বারা গলাধঃকরণ করা হয়। (২) মুসীবতের ঢোক, যাহা সবর দ্বারা গিলিয়া ফেলা হয়। অনুরূপভাবে বান্দার দুইটি বিন্দু আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। (১) সেই বিন্দু যাহা আল্লাহর পথে জেহাদ করিতে গিয়া প্রবাহিত হয়। (২) সেই অশ্রুবিন্দু, যাহা রাতের অন্ধকারে সেজদারত অবস্থায় বান্দার চোখ হইতে পতিত হয় এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ দেখিতে পায় না। বান্দার দুইটি পদক্ষেপ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। (১) ফরজ নামাজের জন্য অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ। (২) আত্মীয়দের সঙ্গে মিলনের পদক্ষেপ।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এক পুত্রের প্রাণবিয়োগ ঘটিলে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে দুইজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া বাদী ও বিবাদীরূপে হযরত

সুলাইমানের দরবারে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিল। বাদী তাহার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলিল, আমি শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছিলাম। চারা অঙ্কুরিত হওয়ার পর এই ব্যক্তি সমস্ত চারা পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিবাদীর বক্তব্য জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, এই ব্যক্তি সর্বসাধারনের চলাচলের পথের উপর বীজ বপন করিয়াছিল। চারাগুলি এমনভাবে গজাইয়াছিল যে, এইগুলি না মাড়াইয়া ডানে-বামে পথ বলিবার কোন উপায় ছিল না। এই কারণেই পথ অতিক্রম করিবার সময় উহা পদদলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) বাদীকে বলিলেন, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, সরকারী পথ দিয়া লোকজন চলাচল করিবেই। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া তুমি সড়কের উপর বীজ বপন করিলে কেন? এইবার বাদী বলিল, তবে আপনি কি কারণে পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন? আপনিও তো অবশ্য অবগত আছেন যে, মানুষ মাত্রেই মৃত্যুর সরকারী সড়কের উপর রহিয়াছে। সুতরাং মৃত্যুর পদদলনে মানুষের প্রাণবিয়োগ তো অনিবার্য। এই কথা শুনিয়া হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নিকট তওবা করিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন না।

খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) মুমূর্ষু পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, বৎস! আমার পূর্বে তোমার ইন্তেকাল হইলে হাশরের দিন আমার পাপ-পুণ্যের ওজনের সময় পাল্লার উপর তোমাকে পাইব। আর আমি তোমার অগ্রে ইহধাম ত্যাগ করিলে তোমার পাপ-পুণ্যের পাল্লায় আমাকে পাইবে। আমার ইচ্ছা, তুমিই আমার পূর্বে পরলোক গমন কর। ফলে আমার পুণ্যের পাল্লায় আমি তোমাকে পাইব। মুমূর্ষু পুত্র জবাব দিল, আব্বাজান! আপনি যাহা কামনা করিতেছেন, আমারও উহাই বাসনা।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সংবাদ দিল, আপনার স্ত্রীর ইন্তেকাল হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ পাক পর্দা ঢাকিয়া দিয়াছেন, কষ্ট শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং ছাওয়াব দান করিয়াছেন। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করিয়া বলিলেন, আল্লাহ পাকের যাহা হুকুম ছিল আমি তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। আল্লাহ পাক এইরূপ হুকুম করিয়াছেন–

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ– সবরের সহিত সাহায্য প্রার্থনা কর নামাজের মাধ্যমে।

হযরত ইবনে মোবারক (রঃ)-এর পুত্রের ইন্তেকাল হইলে জনৈক বিধর্মী তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে এই বাক্যটি আরজ করিল– "বুদ্ধিমানদের উচিৎ, আজ এমন কর্ম সম্পাদন করা যাহা মূর্খ লোকেরা কিছু দিন পরে সম্পাদন করিয়া থাকে।" (অর্থাৎ এই কথা দ্বারা সে ধৈর্য ধারণের কথা বুঝাইতে চাহিয়াছে)। হযরত ইবনে মোবারক সঙ্গের সহচরদিগকে এই বাক্যটি লিখিয়া লইতে বলিলেন। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের উপর মুসীবত নাজিল করিতে থাকেন আর তাহারা জমিনের উপর বিচরণ করিতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তাহাদের জিম্মায় আর কোন গোনাহ অবশিষ্ট থাকে না।

হযরত হাতেমে আসাম্ম (রহঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক চারি প্রকার লোকদের সম্মুখে চারিজন পয়গম্বরকে প্রমাণ স্বরূপ আনয়ন করিবেন।

(১) ধনবান লোকদের সম্মুখে হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে।

(২) দরিদ্রদের সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে।

(৩) গোলামদের সম্মুখে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে।

(৪) অসুস্থ ও পীড়িতদের সম্মুখে হযরত আইউব (আঃ)-কে।

বর্ণিত আছে, হযরত জাকারিয়া (আঃ) যখন আত্মরক্ষার জন্য এক বৃক্ষের ভিতর আত্মগোপন করিলেন, তখন শয়তান কাফেরদের নিকট তাঁহার অবস্থান প্রকাশ করিয়া দিলে কাফেররা একটি করাত লইয়া বৃক্ষটি চিরিতে আরম্ভ করিল। পর্যায়ক্রমে করাত যখন হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর মাথা স্পর্শ করিল, তখন তিনি বেদনায় আহ্! করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওহী নাজিল হইল– হে জাকারিয়া! যদি পুনর্বার কোন শব্দ বাহির হয়, তবে নবুওয়্যতের দফতর হইতে তোমার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর হযরত জাকারিয়া (আঃ) জবান বন্ধ করিয়া সবর করিলেন এবং দুই টুকরা হইয়া গেলেন।

হযরত ইবনে মাসউদ বলখী (রহঃ) বলেন, বালা-মুসীবত আসিবার পর যেই ব্যক্তি হা-হুতাশ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বক্ষে করাঘাত করে, সে যেন বল্লম হাতে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। হযরত লোকমান আপন পুত্রকে বলিলেন, বৎস! আগুন দ্বারা সোনা পরীক্ষা করা হয়। আর মোমেন বান্দাকে পরীক্ষা করা হয় মুসীবত দ্বারা।

আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়কে মোহাব্বত করেন, তখন মুসীবত দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই মুসীবতে যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। আর যেই ব্যক্তি এই মুসীবতে

অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ পাকও তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন।

হযরত আহ্‌নাফ বিন কায়েস (রহঃ) বলেন, একবার আমার চোয়ালে তীব্র ব্যথা হইলে আমি আমার চাচার নিকট গিয়া বলিলাম, চোয়ালে ব্যথার কারণে সারা রাত আমার ঘুম হয় নাই। এই কথাটি আমি তিনবার বলিলাম। জবাবে আমার চাচা বলিলেন, তুমি এক রাতের ব্যথার কারণে এত অভিযোগ করিতেছ। অথচ বিগত ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি দৃষ্টি হারাইয়াছি। কিন্তু আমার এই দৃষ্টিহানীর কথা কেহ জানিতে পারে নাই।

একদা হযরত উজাইর (আঃ)-এর উপর এই মর্মে ওহী নাজিল হইল যে, তুমি আমার মাখলুকের নিকট আমার বিষয়ে কোন অভিযোগ করিও না। কিছু বলার থাকিলে আমার নিকটই বলিবে। তোমার কোন ত্রুটি যখন আমার নিকট পেশ করা হয়, তখন উহা আমি ফেরেশতাদের নিকট উত্থাপন করি না।

মুসীবত কামনা করা

মুসীবতের ফজীলত সংক্রান্ত উপরের বিবরণ পাঠে হয়ত কাহারো মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা মনে হইতেছে, পার্থিব জীবনে নেয়মত অপেক্ষা মুসীবতই উত্তম। সুতরাং মুসীবত প্রার্থনা করা জায়েজ এবং এখন সকলেরই কর্তব্য, আল্লাহ পাকের নিকট মুসীবত প্রার্থনা করা। এই ধারণার জবাবে আমরা বলিব, "মুসীবত কামনা করা" জায়েজ হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। বরং মুসীবত হইতে পানাহ চাওয়াই শরীয়তসিদ্ধ। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত হইতে পানাহ চাহিতেন। অন্যান্য পয়গম্বরগণের প্রার্থনাও এইরূপ ছিল–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

অর্থাৎ– হে পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর।

হযরত আলী (রাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, একবার তিনি এইরূপ দোয়া করিলেন, এলাহী! আমি তোমার নিকট সবর করার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। এই দোয়া শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি আল্লাহর নিকট মুসীবত প্রার্থনা করিতেছ? তুমি বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে একরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমইয়াছেন, আল্লাহ পাকের নিকট আ'ফিয়াত ও

নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। কারণ, কোন মানুষ নিরাপত্তা হইতে উত্তম বিষয় 'একীন' ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হয় নাই। (অর্থাৎ একমাত্র একীনই হইল নিরাপত্তা হইতে উত্তম বিষয়)। এখানে একীন অর্থ এমন সুস্থ অন্তর, যেই অন্তরে সংশয় ও মূর্খতার ব্যাধি নাই। অন্তরের সুস্থতা দৈহিক সুস্থতা অপেক্ষা উত্তম।

হযরত হাছান (রহঃ) বলেন, এমন বিষয় যাহাতে কোনরূপ অনিষ্টের সংমিশ্রণ নাই– তাহা হইল সবরের সহিত সুস্থতা। কেননা, অনেকেই আল্লাহ পাকের বিবিধ নেয়মত ও সুস্থতা লাভ করে বটে, কিন্তু উহার শোকর আদায় করে না।

হযরত মাতরাফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, মুসীবতের উপর সবর করা অপেক্ষা সুস্থতা লাভের পর উহার উপর শোকর করা আমার নিকট উত্তম।

সুতরাং মানুষের কর্তব্য, পার্থিব জীবনে আল্লাহ পাকের নিকট পূর্ণাঙ্গ নেয়মতের জন্য দোয়া করা এবং বালা-মুসীবত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যও দোয়া করিতে থাকা। সেই সঙ্গে ইহাও দোয়া করিতে হইবে, যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া নেয়মতের শোকরের মধ্যেই পারলৌকিক ছাওয়াব প্রদান করেন। কেননা, সবরের বিনিময়ে তিনি যাহা দান করিবেন, ইচ্ছা করিলে তিনি শোকরের বিনিময়েও উহা দান করিতে পারেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, অনেকের লিখনীতে নিজের জন্য মুসীবতের দোয়া করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, 'আমি যেন দোজখের সেতু হইয়া যাই, আর সকলে যেন আমার উপর দিয়া দোজখ অতিক্রম করিয়া নাজাত প্রাপ্ত হয়; এবং শুধু আমি একা দোজখে থাকিয়া যাই"। অনুরূপভাবে ছামনূন লিখিয়াছেন– "কেবল তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্য; যেইভাবে ইচ্ছা আমাকে যাচাই করিয়া দেখিতে পার"। অর্থাৎ এই জাতীয় উক্তি দ্বারা তো মুসীবত প্রার্থনা করাই প্রমাণিত হইতেছে। ইহার রহস্য কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, ছামনূন আশেকের কথা ছিল ভিন্ন রকম। উপরোক্ত মন্তব্যের পর তিনি মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্যতায় আক্রান্ত হন এবং এই সময় তিনি মক্তবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বালকদেরকে বলিতেন, এখন তোমরা তোমাদের মিথ্যাবাদী চাচার জন্য দোয়া কর। অর্থাৎ এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

উপরে অপর যেই বক্তব্যটি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল– সকলকে নাজাতের পথ করিয়া দিয়া নিজে একা দোজখে নিপতিত হওয়ার বাসনা করা। আসলে ইহা একটি অসঙ্গত ও অবাস্তব উক্তি। অবশ্য অনেক সময় মানুষের

অন্তরে আবেগ ও মোহাব্বতের প্রাবল্য এমনভাবে উচ্ছসিত হইয়া পড়ে যে, এমতাবস্থায় সে নিজেকে অনেক অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয়ের উপযুক্ত মনে করিয়া বসে। কারণ, ভাব-আবেগ ও এশকের শরাবের এমনই মাদকতা থাকে যে, উহা পান করিবার পর মানুষ যথার্থই আত্মহারা হইয়া পড়ে। বাহ্যিক জ্ঞান লোপ প্রাপ্ত এই আত্মহারা অবস্থায় মানুষ এমন কিছু মন্তব্য করিয়া থাকে যে, ঐ ভাব কাটিয়া যাওয়ার পর সে নিজেই অনুভব করিতে পারে যে, তাহার সেই মন্তব্য ছিল অবাস্তব ও অসঙ্গত।

মোটকথা, এশক ও মোহাব্বতের হালাতে মানুষের মুখ হইতে এমন অনেক মন্তব্য প্রকাশ পায় যাহা শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই সকল মন্তব্য ও বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে।

কথিত আছে যে, এক কপোত এক কপোতীর সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছিল। কিন্তু কপোতী উহাতে কিছুতেই সম্মত হইতেছিল না। এই পর্যায়ে কপোত সেই কপোতীকে বলিল, তুমি সম্মত হইতেছ না কেন? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তোমার জন্য সুলাইমানের রাজত্বও তচনচ করিয়া দিতে পারি। হযরত সুলাইমান (আঃ) কপোতের এই মন্তব্য শুনিবার পর উহাকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিলেন। কপোত সবিনয়ে আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! এশকে মাতোয়ারা আশেকদের কথা যথার্থ বলিয়া মনে করিতে নাই। জনৈক আশেক বলেন যাহার ভাবার্থ এই–

"আমি কামনা করি মিলন, আর সে কামনা করে বিচ্ছেদ। সুতরাং তাহার কামনার সম্মুখে আমি আমার কামনা ত্যাগ করিলাম।"

আসলে এই বক্তব্যটিও যথার্থ নহে। কেননা, এই ক্ষেত্রে অপ্রিয় বস্তুর প্রার্থী হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ, এখানে 'মিলন' হইল প্রেমাস্পদের মর্জির খেলাফ। অথচ কবি এখানে নিজেকে এই 'মিলন' এর প্রার্থী ঘোষণা করিতেছেন। অথচ উহার পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন– "তাহার কামনার সম্মুখে আমি আমার কামনা ত্যাগ করিলাম।" অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তিনিই আবার 'বিচ্ছেদ' কামনা করিতেছেন। তো যেই ব্যক্তি 'মিলন' কামনা করিবেন তিনিই আবার মিলন-বাসনা ত্যাগ করিয়া বিচ্ছেদ কামনা করিবেন, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? ইহা তো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। অবশ্য এই ক্ষেত্রে যদি উহার রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে উহার দুইটি অর্থ প্রকাশ পাইবে।

প্রথম অর্থঃ অনেক সময় প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের মনের বিপরীত অবস্থা তথা 'বিচ্ছেদ' কামনা করা হয়। কারণ, মনের বিপরীত বাসনাই ভবিষ্যতে মিলনের উসিলা হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে– 'বিচ্ছেদ' সন্তুষ্টি লাভের উসিলা এবং 'সন্তুষ্টি' প্রেমাস্পদের

মিলনের উসিলা। অতএব, যাহা প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের 'উসিলা' হইবে প্রেমিকের নিকট উহা অবশ্যই প্রিয় হইবে। এস্থলে এই কারণেই 'বিচ্ছেদ' কাম্য ও পছন্দনীয় হইয়াছে।

প্রেমিক সর্বদা প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের অকাঙ্ক্ষী হয় বটে, তবে অনেক সময় প্রেমাস্পদের এই মিলন বর্জন করা হয় ভবিষ্যতে তাহাকে আরো ভালভাবে পাওয়ার আশায়।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ প্রেমিক সর্বদা প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টিই কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমিক যদি ইহা জানিতে পারে যে, প্রেমাস্পদ তাহার উপর সন্তুষ্ট, তবে তাহার অন্তরে যেই পরিমাণ আনন্দ অনুভব হইবে– প্রেমাস্পদের সাক্ষাত লাভের পর যদি জানা যায় যে, সে তাহার উপর সন্তুষ্ট নহে, তবে প্রেমাস্পদের সাক্ষাত দ্বারা সেই পরিমাণ আনন্দ অনুভব হইবে না। এমতাবস্থায় এইরূপ হওয়া সম্ভব যে, প্রেমিক উহাই কামনা করিবে– তাহার প্রেমিকা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে।

এই কারণেই আল্লাহর কতক আশেক বান্দা এমন স্তরে পৌছিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি ইহা জানিতে পারেন যে, মুসীবতের হালাতেই আল্লাহ তাহাদের উপর রাজী, আর সুস্থতা ও নিরাপত্তার হালাতে আল্লাহ তাহাদের উপর রাজী কি-না, ইহা যদি তাহারা জানিতে না পারেন তবে শান্তি ও নিরাপত্তার তুলনায় মুসীবতেই তাঁহারা অধিক আনন্দ অনুভব করেন। অর্থাৎ এশক ও আবেগের প্রাবল্যের হালাতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কোন অসম্ভব বিষয় নহে। তবে এইরূপ হালাত বিশেষ স্থায়ী হয় না। মোটকথা, উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, মুসীবত অপেক্ষা সুস্থতা ও নিরাপত্তাই উত্তম।

প্রসঙ্গ ঃ সবর ও শোকর তুলনামূলক আলোচনা

সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, এই বিষয়ে সকলের মতামত অভিন্ন নহে। কেহ বলেন, শোকর অপেক্ষা সবর ভাল। কাহারো মতে সবরের তুলনায় শোকর ভাল। আবার কেহ কেহ উভয়টির মানগত অবস্থান সমান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কতক ব্যক্তি বলিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সবর উত্তম, আবার কোন ক্ষেত্রে শোকর উত্তম। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে মন্তব্যকারীগণ নিজ নিজ মন্তব্যের সপক্ষে যেই সকল দলীল পেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা বিষয়টির সন্দেহাতীত সমাধান উপস্থাপন হয় না।

সুতরাং এ স্থলে সেই সকল দলীল উল্লেখ না করিয়া আসল সত্য ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করাই উত্তম মনে হইতেছে।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে দুই রকম বক্তব্য পেশ করা যায়। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

বিষয়ে অধিক ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া কেবল বাহ্যিক অবস্থার আলোকে সহজভাবে মূল বিষয়টি তুলিয়া ধরা। বস্তুতঃ এই ধরনের আলোচনাই সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হইয়া থাকে। কারণ, তাহাদের সহজ-সরল বোধশক্তি সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। ওয়ায়েজীনগণও অনুরূপ অবস্থা অনুসারেই নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ, ওয়াজের মাধ্যমে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ মানুষের আত্মসংশোধন। যেমন, নবজাতকের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাহাকে বিবিধ উপাদেয়, পুষ্টিকর ও কঠিন খাবার দেওয়া হয় না; বরং সহজপাচ্য দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি তাহাকে সরবরাহ করা হয়। শিশুর শারীরিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ খাবারই তাহার স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। এই সময় যদি গুরুপাক বা অধিক পুষ্টিসমৃধ্য খাবার তাহাকে প্রদান করা হয়, তবে শিশু উহা হজম করিতে পারিবে না বিধায় এই খাবার তাহার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হইবে না।

অনুরূপভাবে এই ক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম আলোচনা সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ উপকারী হইবে না। যাহাই হউক, বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শোকর অপেক্ষা সবর উত্তম। অবশ্য শোকরের ফজীলত প্রসঙ্গে বহু হাদীস উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সবরের ফজীলত তদপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়। এক হাদীসে বর্ণিত আছে– কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শোকরকারী ব্যক্তিকে ডাকা হইবে এবং তাহাকে শোকরের ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। অতঃপর সর্বাপেক্ষা সবরকারী ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলা হইবে, আমি এই শোকরকারী ব্যক্তিকে যেই পরিমাণ ছাওয়াব দান করিয়াছি, তোমাকেও যদি সেই পরিমাণ দেওয়া হয়, তবে তুমি উহাতে সন্তুষ্ট হইবে কি? জবাবে সে বলিবে, আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইব। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, আজ এইরূপ হইবে না; আমি তোমাকে নেয়মত দিয়াছি এবং তুমি উহাতে শোকর আদায় করিয়াছ। তোমাকে মুসীবতে ফেলিয়াছি আর তুমি উহাতে সবর করিয়াছ। সুতরাং আজ আমি তোমাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব প্রদান করিব। অতঃপর তাহাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

অর্থাৎ– সবরকারীদিগকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করা হইবে।
(সূরা যুমার — ১০ আয়াত)

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি খাদ্য খায় এবং শোকর করে, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে রোজা রাখে এবং সবর করে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সবরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা, শোকরের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহাকে শোকরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। 'সবর' শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলে উহাকে সবরের সঙ্গে তুলনা করা হইত না। সাধারণতঃ কোন বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য উহাকে অপর এমন বিষয়ের সঙ্গেই তুলনা করা হয়, যাহা উহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। হাদীসের বিবরণেও এই ধরনের তুলনা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

"বিত্তহীনদের হজ্ব হইল জুমুআ এবং নারীদের জেহাদ হইল স্বামীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।" অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে আছে–

شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ

অর্থাৎ– "শরাব পানকারী যেন মূর্তি পূজকের মত।"

মোটকথা, এই সকল আলোচনা দ্বারা শোকর অপেক্ষা সবরের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন– নবীগণের মধ্যে হযরত সুলাইমান (আঃ) রাজত্বের কারণে সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন। আর আমার ছাহাবীগণের মধ্যে ধনাঢ্যতার কারণে আব্দুর রহমান বিন আউফ সকলের পরে জান্নাতে যাইবে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ও মুসীবতগ্রস্তদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে– বেহেশতের সকল দরজারই কপাট হইবে দুইটি। কিন্তু 'বাবে সবর' বা সবরের দরজার কপাট হইবে একটি। সর্ব প্রথম যেই ব্যক্তি দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে, সে হইবে মুসীবতগ্রস্ত। আর তাহাদের নেতা হইবেন হযরত আইউব (আঃ)।

সুতরাং "ফাজায়েলে ফকর" বা দরিদ্রতার ফজীলত দ্বারাও বিপদগ্রস্ত ও বিত্তহীন অভাবীদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ সবর হইল অভাব ও দরিদ্রতার 'হাল' এর নাম। আর শোকর হইল ধন্যাঢ্যতার 'হাল' এর নাম। আমাদের এই (সহজবোধ্য) আলোচনা দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হইবে এবং ইহাতে তাহাদের ধর্মীয় কল্যাণ নিহিত।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি এমন যাহা দ্বারা আলেম-ওলামা এবং অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের সূক্ষ্ম বিশেষণ দ্বারা উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, দুইটি অস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে কখনো তুলনা করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ দুইটি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর তুলনা করিতে হইলে উভয়টির হাকীকত এবং উহাদের স্বরূপ স্পষ্ট হইতে হইবে। আর এই বিষয়দ্বয়ের প্রত্যেকটির যদি বিভিন্ন ধরন থাকে তবে

সেই ক্ষেত্রেও ধরনসমূহ পৃথক না করিয়া সামগ্রিকভাবে ঐ দুইটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা চলিতে পারে না। বরং বিষয়দ্বয়ের প্রতিটি ধরন ও প্রকার পৃথক করিয়া উহাদের মধ্যে পৃথকভাবেই তুলনা করিতে হইবে। সবর ও শোকরের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার রহিয়াছে। সুতরাং এইগুলিকে পৃথক না করিয়া সামগ্রিকভাবে উহাদের মধ্যে তুলনা হইতে পারে না।

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সবর-শোকর এবং এই জাতীয় বিষয়াদি তিন প্রকারে বিভক্ত। যেমন মারেফাত (জ্ঞান), হাল এবং আমল। তো একটির হালের সহিত অপরটির মারেফাত কিংবা আমলের সঙ্গে তুলনা করিলে চলিবে না। বরং একটির মারেফাতের সহিত অপরটির মারেফাতের, একটির হালের সহিত অপরটির হালের এবং একটির আমলের সহিত অপরটির আমলের তুলনা করিতে হইবে। অর্থাৎ এইভাবে সমপর্যায়ে তুলনা করিলেই একটির উপর অপরটির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাইবে। এখন শোকরের মারেফাত ও সবরের মারেফাতের মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, তবে উভয়টির ফলাফল অভিন্ন মারেফাতে আসিয়া যুক্ত হইবে। যেমন, চক্ষুর ব্যাপারে শোকরকারীর মারেফাত এই যে, সে উহাকে আল্লাহর নেয়মত মনে করিয়া শোকর আদায় করিবে। আর এই চোখ সম্পর্কে সবরকারীর মারেফাত হইল, সে নিজের অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে জানিয়া উহার উপর সবর করিবে। এখানে সবর ও শোকরের মারেফাত বরাবর হইয়াছে। তবে এখানে যেই যেই সবরের কথা বলা হইল, তাহা বালা-মুসীবতের সবর হইতে হইবে। কারণ, অনেক সময় এবাদত কিংবা গোনাহের ক্ষেত্রেও সবর হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সবর ও শোকর হইবে অভিন্ন। কেননা, এবাদতে সবর করা হুবহু এবাদতে শোকর করারই অনুরূপ হইবে। যেমন, শোকরের অর্থ হইল, আল্লাহর নেয়মতকে আল্লাহর হেকমত ও মানসা অনুযায়ী ব্যবহার করা। আর সবরের অর্থ হইল, খাহেশাতের প্রেরণার স্থলে দ্বীনী প্রেরণা কায়েম করতঃ উহাতে মজবুত থাকা। এখানে সবর ও শোকর নামে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাইতেছে এবং উহাদের মধ্যে ব্যবধান কেবল বিশ্বাসগত। সুতরাং এখানে একটির উপর অপরটির প্রাধান্যের কোন সুযোগ নাই। কারণ, অভিন্ন উপাদানের কোন বিষয় আপন সত্ত্বায় কম-বেশী হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

সবর তিনটি ক্ষেত্রে সম্পাদন হইতে পারে। এবাদত, পাপ এবং মুসীবত। এবাদত ও পাপের ক্ষেত্রে উহার অবস্থান ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা মুসীবত সম্পর্কে আলোচনা করিব। নেয়মত বিলুপ্ত ও নিঃশেষ হইয়া যাওয়াকেই মুসীবত বলা হয়। যেমন, চক্ষু আল্লাহর দেওয়া একটি

প্রয়োজনীয় ও জরুরী নেয়মত। এই নেয়মতের ক্ষেত্রে সবর হইল- উহা বিলুপ্ত বা নিঃশেষ হইয়া গেলেও কোন প্রকার অভিযোগ না করা এবং অন্ধত্বের কারণে অপর কোন গোনাহের অনুমতি প্রার্থনা না করা। অপর দিকে আমলের ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির শোকর এই যে, আল্লাহর দেওয়া চক্ষুরূপ নেয়মতকে কোন প্রকার গোনাহের কাজে ব্যবহার না করিয়া এবাদত ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা। এই দুইটি আমলও সবরের মধ্যে গণ্য। যেমন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কোন সুন্দরী নারীকে দেখার ব্যাপারে সবর করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, সে তো তাহাদিগকে দেখিতেই পায় না। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি কোন সুন্দরী নারীর উপর পতিত হওয়ার পর যদি সবর করে (অর্থাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে) তবে সে চোখের নেয়মতের শোকর করিল। আর হঠাৎ পতিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় বারও সেই নারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তবে চোখের নেয়মতের নাশোকরী করা হইবে।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, শোকরের হালাতে সবরও নিহিত। অনুরূপভাবে কোন এবাদতে যদি চোখের সাহায্য গ্রহণ করা হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও আনুগত্যেরই সবর কথা হইবে। মানুষ অনেক সময় চোখের নেয়মতের শোকর এইভাবে আদায় করে যে, আল্লাহ পাকের অদ্ভুত সৃষ্টি নৈপুণ্য অবলোকন করিতে থাকে যেন উহার ফলে আল্লাহর মারেফাত পর্যন্ত পৌছাইতে পারে। এই জাতীয় সবর শোকর অপেক্ষা উত্তম। অন্যথায় অন্ধ নবী হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর মর্তবা হযরত মূসা (আঃ) এবং অপরাপর পয়গম্বরগণ অপেক্ষা বেশী হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িবে। কারণ, তিনি দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার কারণে সবর করিয়াছিলেন- কিন্তু এই সবর হযরত মূসা (আঃ)-সহ অপরাপর নবীগণের মধ্যে ছিল না। তা ছাড়া এই প্রক্রিয়া মানিয়া লইলে ইহাও মানিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িবে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব হইল- একে একে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিনষ্ট হইতে থাকিবে আর সে সবর করিতে করিতে অবশেষে কেবল একটি গোশতের টুকরায় অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবে এইরূপ হওয়ার কোন সুযোগ নাই। উহার কারণ এই যে, মানব দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ দ্বীনের একটি হাতিয়ার। সুতরাং মানুষের কোন অঙ্গ যখন বিনষ্ট হইবে তখন দ্বীনের সেই রোকনটিও বিনষ্ট হইবে- যেই রোকনের জন্য এই অঙ্গটি হাতিয়ার হিসাবে নিযুক্ত হইবে- মানব দেহের অঙ্গের শোকর হইল- যেই দ্বীনী উদ্দেশ্যে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই কাজে উহাকে ব্যবহার করা। আর মানব অঙ্গের এই ব্যবহারও সবর ছাড়া আর কিছু নহে।

মানুষ প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর যদি তাহার আরো অধিক সম্পদের প্রয়োজন হয়, তবে এই ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত সম্পদের উপর সবর

করার নাম মোজাহাদা। এই মোজাহাদা বিত্তহীন দরিদ্র ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যায়, তবে এই অতিরিক্ত সম্পদকে নেয়মত বলা হইবে। উহার শোকর এই যে, উহা দান করিয়া দিতে হইবে এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। অর্থাৎ এখানে আল্লাহর আনুগত্যের পথে সম্পদ ব্যয় করাকে শোকর বলা হইয়াছে। সুতরাং এই শোকরকে বর্ণিত সবরের সঙ্গে তুলনা করা হইলে শোকর উত্তম হইবে। কেননা, এই শোকর নিজের মধ্যে সবরকেও ধারণ করিয়া আছে। শোকরের মধ্যে নিহিত এই সবর হইল– আল্লাহর নেয়মত পাওয়ার পর সন্তুষ্ট হইয়া উহা গরীবদের মধ্যে দান করিয়া দেওয়ার কষ্ট সহ্য করা এবং বিলাসিতায় ব্যয় না করা।

সারকথা হইল, বর্ণিত শোকরের মধ্যে দুইটি বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার একটি হইল সবর এবং অপরটি শোকর। তবে এই ক্ষেত্রে শোকর হইল মুখ্য এবং সবর উহার ক্ষুদ্র অংশ। বলাবাহুল্য, কোন বিষয়ের ক্ষুদ্রাংশের তুলনায় উহার মুখ্য অংশই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। তবে এই ক্ষেত্রে এতটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মুখ্য অংশের সঙ্গে ক্ষুদ্র অংশের তুলনা সঙ্গত হইবে না। অবশ্য এই নেয়মতকে যদি গোনাহের কাজে ব্যয় না করিয়া বৈধ ও জায়েজ ভোগ-বিলাসের কাজে ব্যয় করা হয় তবে সবর শোকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে এবং সবরকারী দরিদ্র ব্যক্তি এমন বিত্তবানের তুলনায় উত্তম হইবে, যে নিজের অর্থ-বিত্ত জমা করিয়া বৈধ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করে। কিন্তু এমন বিত্তবানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইবে না যে, নিজের অর্থ-বিত্ত দান খয়রাত করিয়া দেয়। উহার কারণ এই যে, দরিদ্র ব্যক্তি নিজের চাহিদাকে সংযত করিয়া আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তমরূপে রাজী ছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এক প্রবল আত্ম-শক্তির প্রয়োজন হয়।

পক্ষান্তরে বিত্তবান ব্যক্তি নিজের মনের কামনা-বাসনা পূরণ করিয়াছে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে সে বৈধ পথেই মনের চাহিদা মিটাইয়াছে এবং হারাম হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। তবে এই হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আত্ম-শক্তির প্রয়োজন হয়। অবশ্য দরিদ্র ব্যক্তি তাহার নিজস্ব অঙ্গনে যেই শক্তি দ্বারা সবর ও ধৈর্য ধারণ করে, উহা বিত্তবানের হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকার শক্তি অপেক্ষা বহু গুণ শ্রেষ্ঠ।

উপরোক্ত বিবরণের আলোকে ইহা প্রমাণিত হইল যে, বিত্তবানের সবরের শক্তি অপেক্ষা দরিদ্রের সবরের শক্তি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে পাকে এই বিশেষ শ্রেণীর সবর ও শোকরের ফজীলতই বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, লোকেরা মনে করিয়া থাকে, নেয়মতের অর্থ হইল, ধন-সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়া। আর শোকরের অর্থ হইতেছে মুখে "আল হামদুলিল্লাহ" বলা

এবং কোন গোনাহের কাজে নেয়মতের সাহায্য গ্রহণ না করা। অথচ এই কথা কেহই বুঝিতে চেষ্টা করে না যে, নেয়মত কেবল এবাদতের কাজেই ব্যবহার করিতে হইবে।

সারকথা হইল, সাধারণ মানুষ যাহাকে সবর বলে তাহা এই শোকর হইতে উত্তম। সবর ও শোকরের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে হযরত জোনাইদ (রহঃ) বলিয়াছিলেন, বিত্তবানের প্রশংসা যেমন ধনের কারণে নহে, ঠিক তেমনি দরিদ্রের প্রশংসাও ধন না থাকার কারণে নহে। বরং তাহাদের নিজস্ব অবস্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করিলেই তাহারা প্রশংসার যোগ্য হইবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, বিত্তবানের শর্তসমূহ তাহার স্বার্থের অনুকূল। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে নেয়মত দ্বারা উপকৃত হওয়া তথা ভোগ-আনন্দ ইত্যাদি বিদ্যমান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে বিত্তহীন অবস্থার শর্তসমূহ বিত্তহীনের জন্য কষ্টদায়ক এবং হতোদ্যমকারী। এখন ইহা স্পষ্ট কথা যে, এমতাবস্থায় এই উভয় শ্রেণী যদি আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ নিজ অবস্থায় নিজেদের শর্তসমূহ পালন করিয়া চলে, তবে যেই ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে রাখিবে এবং ভগ্নোৎসাহ থাকিবে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হইবে যে নিজেকে ভোগ-বিলাস ও আরামে রাখে। সুতরাং হযরত জোনায়েদের মন্তব্য যথার্থ ছিল।

কথিত আছে যে, আবুল আব্বাস বিন আতা উপরোক্ত প্রশ্নে হযরত জোনায়েদ (রহঃ)-এর বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। অর্থাৎ তাহার বক্তব্য ছিল– একজন সবরকারী দরিদ্র অপেক্ষা শোকরকারী বিত্তবান উত্তম। এই ধারণা পোষণ করার কারণে হযরত জোনায়েদ (রহঃ) তাহাকে বদ দোয়া দেন এবং উহার ফলে তিনি বিবিধ অনিষ্টের শিকার হন। তাহার ধন-সম্পদ নষ্ট হইয়া যায় এবং সন্তানেরা নিহত হয়। এমনকি ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তিনি উম্মাদ অবস্থায় অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করেন। এই বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিতেন, আমার উপর জোনায়েদের বদদোয়া লাগিয়াছে। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি সবর-শোকর সম্পর্কে নিজের ধারণা প্রত্যাহার করিয়া শোকরকারী ধনীর উপর সবরকারী গরীবকে প্রাধান্য দেন।

উপরে শোকরকারী ধনী অপেক্ষা সবরকারী গরীবের প্রাধান্য বর্ণনা করা হইল। কিন্তু অনেক সময় সবরকারী গরীব অপেক্ষা শোকরকারী ধনীও উত্তম হইয়া থাকে। তবে উহা কেবল সেই ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব, যেই ক্ষেত্রে শোকরকারী ধনী ব্যক্তি নিজেকে নিতান্ত ফকীরের মত মনে করে এবং নিজের জন্য কেবল জরুরত পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেয় কিংবা এই উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে যেন প্রয়োজনের সময় উহা বিত্তহীন দরিদ্রদের কাজে লাগানো যায়। অতঃপর সে তাহাদের

অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখে এবং সময় মত ঐ সম্পদ তাহাদের জন্য ব্যয় করে। আর এই ক্ষেত্রে সে নিজের কোন খ্যাতি-কল্যাণ বা অপর কোন স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করে না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরীব-মিসকীনদের হক আদায় করাই থাকে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ শোকরকারী ধনী ব্যক্তি, সবরকারী গরীব অপেক্ষা উত্তম হওয়ার বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্য এখানে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একজন বিত্তহীন গরীব ব্যক্তির পক্ষে নিজের দৈন্যদশার উপর সবর করা কষ্টকর বটে, কিন্তু শোকরকারী বিত্তবানের পক্ষে তো দান করা তেমন কোন কষ্টকর কর্ম নহে! সুতরাং কষ্টের দিকটি বিবেচনা করিলে সবরকারী গরীব ব্যক্তিই উত্তম হওয়া যুক্তিযুক্ত। আর বিত্তবানের পক্ষে দান করা কিছুটা কষ্টকর হইলেও 'দান করা'র মধ্যে যেই আত্মসুখ অনুভূত হয় উহা দ্বারাই সেই কষ্ট দূর হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা এমন বিত্তবান ব্যক্তিকেই 'উত্তম' মনে করি, যে নিজের সম্পদ স্বেচ্ছায় ও খুশীর সহিত দান করে। কিন্তু যেই কৃপণ মালদার নিতান্ত কষ্টের সহিত নিজের মাল দান করে, তাহার অবস্থা কখনো 'উত্তম' নহে।

সারকথা হইল, দান কিংবা সবরের মাধ্যমে আত্মায় নিছক পীড়ন সৃষ্টি করাই মূল উদ্দেশ্য নহে; বরং আত্মার সংশোধন ও সুখ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই সাময়িক পীড়নের আয়োজন করা হয়। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ- শিকারী জীবকে প্রশিক্ষণের সময় প্রহার করা হয়। কিন্তু এই প্রহার ও পীড়ণ কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নহে। বরং ভবিষ্যতে এই প্রশিক্ষণের ফলে প্রাপ্ত সুখের মোকাবেলায় এই কষ্টকে কিছুই মনে করা হইবে না। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় যাহা কষ্টকর মনে করা হয় পরবর্তীতে উহাকে আর কষ্টকর বলিয়া মনে করা হয় না। যেমন একজন সচেতন তালেবুল এলেমের নিকট 'পড়াশোনা' আত্মতৃপ্তিকর ও আত্মার খোরাক বলিয়াই বিবেচিত হয়। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় ইহা ছিল একটি 'বিরক্তিকর' বিষয়। তো ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা এইরূপই বটে।

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, একবার সফরের হালাতে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যৌবনে আমি আমার এক চাচাতো বোনের প্রতি প্রচণ্ডভাবে আসক্ত ছিলাম। আমার সেই বোনটিও আমাকে মনেপ্রাণে ভালবাসিত। অবশেষে আমাদের এই পবিত্র ভালবাসা স্বার্থক হয় এবং আমাদের পরস্পরে বিবাহ হয়।

বৃদ্ধ বলেন, বাসর রাতে আমি আমার নব পরিণীতা স্ত্রীকে বলিলাম, আল্লাহ পাক আমাদের উভয়ের মনের আশা পূরণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার শোকর আদায় করা আমাদের কর্তব্য। অতঃপর আমরা উভয়ে সেই বাসর রাতটি

শোকরানা নামাজের মধ্যে কাটাইয়া দিলাম। দ্বিতীয় রাতটিও আমরা অনুরূপ শোকরগুজারীতে কাটাইয়া দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে মুসাফির! বর্তমানে আমার বয়স আশির কোঠা অতিক্রম করিয়াছে। সেই কতকাল হইতে আমরা ক্রমাগত আল্লাহর শোকরগুজারীতে নিরত আছি। এই সুদীর্ঘ জীবনে এখনো আমাদের একান্ত সান্নিধ্যর সুযোগ হয় নাই।

বর্ণনাকারী বুজুর্গ বলেন, অতঃপর আমি তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীর নিকট গিয়া ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার স্বামী যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য।

উপরোক্ত ঘটনায় লক্ষণীয় বিষয় হইল, মনে কর তাহাদের মধ্যে যদি বিবাহ না হইত এবং তাহাদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেম ও বিরহের অগ্নি ধারণ করিয়া যদি সবর করিত, তবে সেই সবর এবং আজিকার এই নিরবচ্ছিন্ন শোকরের মধ্যে তুলনা করা হইলে নিঃসন্দেহে এই সবরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি আমি এখানেই শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যথাযথভাবে সবর ও শোকর করার তওফীক দান করুন। আমীন!

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।